প্রেম ও প্রয়োজন

আঃ পুঃ বঃ—১-১

উত্তর কলিকাতার এক অপরিসর গলির এক প্রান্তে যে পতনোন্মুখ বাড়িখানি তাহার হাড়-পাঁজরা-সার দেহখানি লইয়া দীর্ঘকাল একই অবস্থায় টিঁকিয়া আছে, তাহারই রোয়াকের উপর বসিয়া সকালের রৌদ্রে পিঠ দিয়া কয়েকটি যুবক উদ্দাম তর্কের ঝড় তুলিয়াছিল।

তর্কের বিষয়বস্তু যাহাই হউক সাদা বাংলায় ইহাকে আড্ডা দেওয়াই বলে এবং দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে—যুদ্ধের চাহিদায় বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান ঘটিলেও ইহাদের কাছে সমস্যাটা সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে।

সিমেণ্ট চটিয়া যাওয়া, খাপ্‌রি ওঠা, ভাঙ্গা রোয়াকে বসিয়া আধ-ময়লা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া ইহারা কথা কয় বড় বড়, আদর্শ গড়ে বিরাট, আর স্বপ্ন দেখে অসম্ভবের।

ইহাদের মধ্যে প্রবীর বলিয়া ছেলেটিই শুধু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে; তাহার বেশভূষার বৈশিষ্ট্য বাদ দিলেও, চেহারার লাবণ্য, মুখের সৌকুমার্য্য, সহজেই তাহার আভিজাত্যের প্রমাণ দেয়।

তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া সমর কহিল—তোমার কথা বাদ দাও না, সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছ, দুনিয়ার হালচাল তো কিছু জানলে না; তোমাদের মত নাড়ুগোপালদেরই বিয়ে করা মানায়।…আমরা—যারা লোহা পিটবো, কুলি খাটবো, রিক্‌শা টানবো, তাদের জন্যে বিয়ে নয়।

প্রবীর মৃদু হাসিয়া কহিল—এমনি বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, বাটনা বাটবে, এমন মেয়েরও তো অভাব নেই।

—অভাব হয়তো নেই, কিন্তু আমি চাই না যে আমার স্ত্রী এসে বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, বাটনা বাটবে।

—কিন্তু তুমি যদি লোহা পিটতে পারো, তোমার স্ত্রীই বা কেন বাসন মাজতে পারবে না শুনি?

কথাটা অপর কেহ বলিলে হয়তো সাধারণ তর্কের পর্য্যায়ে ফেলা হইত, কিন্তু প্রবীর ধনীর সন্তান বলিয়াই বোধ করি ইহার মধ্যে অহঙ্কারের গন্ধ আবিষ্কার করিয়া সমর ঝাঁজালো গলায় উত্তর দিল—ভালবাসার জিনিস সকলেরই সমান, বুঝলে প্রবীর? অবস্থার গতিকে আমাদের ছোট কাজ করতে হতে পারে, তাই বলে—ভালবেসে যাকে ঘরে আনবো তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে না পারলে, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে না পারলে, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এটা কি করে আশা করছো তুমি? স্ত্রীকে 'দাসী' বলবার যুগ চলে গেছে বলেই আমরা আজ বিয়ে করতে ভয় পাই, কুণ্ঠিত হই।

প্রবীর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া কহিল—তোমার ভাষার ছটা আর কথার ঝাঁজ দেখে মনে হচ্ছে ভয় কেটে এসেছে।

—অর্থাৎ ?

চাপা কপাল আর উদ্ধত চোয়ালের জন্ম সমরের মুখটায় আনিয়াছে একটা পৌরুষের ছাপ, স্বভাবটাও তেমনি তাহার উদ্ধত। সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যেন খাড়া দাঁড়াইয়াছে অস্ত্রে শান দিয়া।

পাড়ার ছেলে প্রবীর, ছেলেবেলা হইতেই একত্রে স্কুলে গিয়াছে, স্কুল পলাইয়াছে, লাট্টু ঘোরাইয়াছে, মার্বেল খেলিয়াছে, কিন্তু তবু—প্রবীরকে দেখিলে সমরের রাগে গা জ্বালা করে, কথা শুনিলে বিষ লাগে। সমরের ক্রুদ্ধমুখের "অর্থাৎ" শুনিয়া কিন্তু প্রবীরের হাসি বন্ধ হইল না, সে তেমনি হাসিমুখে কহিল—অর্থাৎ মনে হচ্ছে যাঁকে ভালবেসেছ তাঁকে ঘরে আনতে বিলম্ব সইছে না।

—তার মানে ভালবাসাটা তোমাদের মত বড়লোকের নাড়ুগোপালদের একচেটে, কি বল ?

মানেটা অবশ্য প্রাঞ্জল নয়, এবং কেবলমাত্র কলহ বাধাইবার জন্ম "ধান ভানতে শিবের গীতের" মত একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা আনিয়া ফেলায় উপস্থিত সকলেই সমরের উপর বিরক্ত হইল।

আবহাওয়াটা হালকা করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে অমরেশ একটু আড়ামোড়া ভাঙিয়া কহিল —ভালবাসার রাইট নিয়ে যদি তর্কই ফাঁদতে হয় তো রোসো এক পেয়ালা করে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

অমরেশ এই বাড়ীরই ছেলে, এবং ইহাদের রোয়াকে আড্ডাটা বসে বলিয়া মাঝে মাঝে চায়ের খরচটাও যোগাইতে হয় তাহাকেই। আবার ভাঙা রোয়াকে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া যেদিন ব্রিজের আসর বসে, সেদিন ঘন ঘন চায়ের ফরমাসে [redacted] কর্ত্রী উত্যক্ত হইয়া উঠেন।

অমরেশ যে তাহা না জানে এমন নয়, তবু বাড়ীর ভিতরের অনেক রকম কথা হজম করিয়াও সে বন্ধু মহলে নিজের যথার্থ অবস্থাটা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে।

শীতের সকালে সহনীয় রৌদ্রটা তখন ধীরে ধীরে মাত্রা ছাড়াইতে সুরু করিয়াছে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রবীর কহিল—থাক্‌না, আবার এখন চায়ের হাঙ্গামা কেন অমরেশ ? শুধু শুধু বৌদিকে জ্বালাতন করা। ভালবাসার তর্কটা না হয় মুলতুবী থাক এখনকার মত। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সভা ভঙ্গ হোক।

—না না, বৌদি মোটেই জ্বালাতন বোধ করেন না, খুব খুশি হ'ন—বলিয়া অমরেশ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

অমরেশের বৌদি আরতি কোলের ছেলের আহারপর্ব্ব সমাধা করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভাতমাখা ছেলেটিকে টানিয়া কলতলায় লইয়া চলিয়াছিল, অমরেশকে দেখিয়া বিব্রতভাবে হাতের উল্টা-পিঠে মাথার কাপড়টা টানিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—দেখেছ ঠাকুরপো, কি দুষ্টু ? খাওয়ার বেলায় বেশ ওস্তাদ, অথচ এখন শীতের ভয়ে আঁচাতে রাজী নয়।···এই গাধা, শীগগির চল্ নইলে কাকা মারবে।

ওস্তাদটি বাড়ীর মধ্যে সকলকেই অবজ্ঞার চোখে দেখেন, কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে বলা শক্ত কাকাকে অপেক্ষাকৃত সমীহ করিয়া চলেন। কাজেই অনিচ্ছুক গতিটা মুহূর্তে পরিবর্তন করিয়া বাধ্য ছেলের মত তিনি গুটিগুটি মায়ের অনুসরণ করিলেন।

আরতি ফিরিয়া আসিতেই অমরেশ মিনতির সুরে কহিল—বৌদি লক্ষ্মীটি, চুপি চুপি পেয়ালা চার-পাঁচ চা করে দিতে পার?

—চা? এখন? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে না?

—আরে চায়ের আবার বেলা-অবেলা! উনুনে আগুন নেই?

—ও মা কী কাণ্ড, আগুন থাকবে না কেন? কিন্তু—

এদিক ওদিক চাহিয়া আরতি গলা নামাইয়া কহিল—পিসীমা না দেখতে পান। এই খানিক আগেই বকাবকি কচ্ছিলেন।

—কি জন্যে শুনি?

—অমরেশের রুক্ষ প্রশ্নে কুণ্ঠিত হইয়া আরতি কহিল—কারণ সেই একই, 'খরচ আর খরচ', 'এরকম উড়নচণ্ডে বাড়ীতে মা লক্ষ্মী টিকতে পারেন না—' এই সব।

অমরেশের মুহূর্তের জন্য মনে হইল, থাক প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইমাত্র বন্ধুমহলে বড়মুখ করিয়া বলিয়া আসিয়াছে—এখন কোন মুখে আবার বলিতে যাইবে সামান্য দু'চার পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করিবার স্বাধীনতাও তাহার নাই, নিজের বাড়ীতে নিতান্ত পরের মতই থাকিতে হয় তাহাকে।

আরতি বোধ করি তাহার মুখের ভাবে মনের অবস্থা অনুমান করিয়া লইল, তাই আঁচলে ছেলের মুখ মুছাইয়া কোল থেকে নামাইয়া দিয়া কহিল—আচ্ছা আর ভাবতে হবে না, দিচ্ছি চুপি চুপি, একে একটু ধরো দেখি।

—তা ধরছি, কিন্তু পারবে তো? না কি তোমায় আবার বকুনি খেতে হবে?

—না না, ঠিক হয়ে যাবে।

লঘু ক্ষিপ্রপদে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল আরতি।

ছেলেটিকে র‍্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া অমরেশ আবার বাহিরে আসিয়া বসিল। হাসিমুখে কহিল—হচ্ছে ব্যবস্থা, একটু বোস ভাই।

ভিতরবাড়ীর রৌদ্রলেশ-শূন্য দালানে, স্যাঁতসেঁতে ঘরে, ছোট্ট ছেলেটি যেন এতক্ষণ শীতে নীল হইয়া গিয়াছিল, রৌদ্রের আঁচে তাজা হইয়া কাকার কোল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় ঝুলোঝুলি সুরু করিল।

"কালো গৌরাঙ্গ" ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকে, খোকার সহিত তাহার যথেষ্ট সৌহার্দ্য আছে, তাহার ছট্‌ফটানি দেখিয়া কহিল—এই অমরেশ, ছেড়ে দেনা ওকে, আটকে রেখেছিস কেন?

—তার কারণ এটি এখন বাবা আদমের সেকেণ্ড এডিশন্।...এই শয়তান, খবরদার নড়বি না।

কিন্তু শয়তান ততক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছেলেটির রং খুব ফরসা নয়, কিন্তু নিখুঁত মুখশ্রী ও নিটোল গঠনভঙ্গী দেখিবার মত। তাছাড়া বয়স্কদের কাছে শিশুর মত লোভনীয় খেলনা আর কিছুই নাই, টানিয়া পিটিয়া নাচাইয়া দুরন্ত ছেলেকেও নাকাল করিয়া তুলিতে বিলম্ব হইল না।

অবশেষে কাঁদাইয়া ক্ষান্ত হইয়া বিজয় হাসিয়া কহিল—যাই বল অমরেশ, তোমার দাদার তুলনায় ছেলেটি যেন গোবরে পদ্মফুল।

—তার কারণ খোকা ঠিক ওর মার মত—ঈষৎ গর্বিতভাবেই অমরেশ কহিল—বৌদির চেহারা বাস্তবিকই দেখবার মত ছিল, খোকার রংটা তবু তার মায়ের মত নয়, কিন্তু সংসারের চাপে আর অযত্নে বৌদি বেচারার এখন আর কিছুই নেই।…ভালবাসার তর্ক তুলেছিলে সমর? আমাদের দাদা-বৌদির বিয়েও তো শুনেছিলে বোধ হয় 'লাভ ম্যারেজ'। জামালপুরে মেজ-পিসীর বাড়ী দাদা গিয়েছিলেন চেঞ্জে—আর বৌদি এসেছিলেন মামার বাড়ী বেড়াতে—তারপর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। কিন্তু এখন? এখন, এই বছর সাতেকের মধ্যেই বৌদি একটি সংসারভার প্রপীড়িতা বৃদ্ধা, আর দাদা ইহলোকের অনিত্য সুখ ত্যাগ করে পরলোকের চিন্তায় মন দিয়েছেন, সারাদিনে দুটো গল্প করবারও সময় হয় না তার।

প্রবীর এতক্ষণ খোকার কান্না থামানোর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল, পেন্সিল রুমাল প্রভৃতি পকেটস্থিত যাবতীয় বস্তু ঘুষ দিয়া যখন প্রায় বাগে আনিয়াছে তখন সহসা অমরেশের শেষ কথাটা কানে যাইতেই মুখ ফিরাইয়া সকৌতূহল প্রশ্ন করিল—পরকালের চিন্তাটা কি অমরেশ?

—শোননি বুঝি, দাদা এক গুরু করেছেন? ইয়া জটাজুটধারী অবধূত বাবা! তাঁর নির্দ্দেশে রাত তিনটে থেকে উঠে সাধনা করতে হয়, এবং এই সাধনার ফলে মনে হচ্ছে প্রায় আধ-সিদ্ধ হয়ে এসেছেন, আর কিছুদিন গেলেই পুরোপুরি সুসিদ্ধ হয়ে পড়বেন। ব্যাস্ তখন আর তাঁকে পায় কে? একেবারে শ্রীমৎ অখিলেশানন্দ স্বামী—স্ত্রী পুত্র পরিবার সব তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ—জগৎটা স্রেফ্ ভুয়ো।

গলির ভিতর গায়ে গায়ে বাড়ী, মেয়ে মহলে যাতায়াত আছে, কাজেই তাঁদের মারফৎ বিজয় মল্লিক, কালো গৌরাঙ্গ, সমর প্রভৃতির এসব তথ্য জানা ছিল, ছিলনা শুধু প্রবীরের; কারণ তাহার মা-খুড়িমা নিজেদের প্রেষ্টিজ ভুলিয়া পাড়া বেড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নারাজ এবং এ পক্ষও বড়লোকের ছায়া মাড়াইতে রাজী ছিলেন না।

কাজেই প্রবীর উৎসুক প্রশ্ন করিল—হঠাৎ এ রকম হবার মানে?

—মানে? দাদা বলেন—গুরু যখন যাকে কৃপা করেন—ও সব তোমার-আমার বুদ্ধির অগম্য প্রবীর!

—বৌদির তো তা'হলে খুবই কষ্ট?

—হিসেব মত তাই হওয়াই উচিত, কিন্তু এও আমার বুদ্ধির অগম্য প্রবীর, আজ পর্য্যন্ত কখনো দেখলাম না—মুখে তাঁর হাসির অভাব, কখনো দেখলাম না—দাদার ওপর এতটুকু

বিরক্তি। শেষ রাত্রে উঠে দাদার পুজোর গোছ করে দেন, মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত দাদার খাবার নিয়ে বসে থাকেন।

—অর্থাৎ একদা যে বিবাহকে 'লাভ ম্যারেজ' বলে উভয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, আসলে সেটি মায়ামৃগ।—প্রবীর মন্তব্য প্রকাশ করিল।

সমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কেন, তোমার তো মতে গরীবের স্ত্রীর কিছুতেই কষ্ট হওয়া উচিত নয়—বাসন মাজতে, ধান ভানতে—

—সে মত আমার বদলায়নি সমর, যদি ভালবাসা থাকে।

সমর ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে কহিল—এটা কি উল্টো কথা হ'ল না? কত বড ভালবাসা থাকলে মানুষ এমন আত্মহারা হয়ে, নিজের সত্তা হারিয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে—সে আইডিয়া আছে?

—বল যে কতখানি 'ঘোডার ডিম থাকলে'--একটা তীক্ষ্ণ হাসির রেখা মুখে আনিয়া প্রবীর কহিল—নিঃস্বার্থ ভালবাসা হচ্ছে 'সোনার পাথববাটি', বুঝলে সমর? যেখানে অভিমান নেই, সেখানে ভালবাসা আছে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজও নেই, কোনদিনও ছিল না।

আলোচনাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলিযা অমরেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, উদ্ধার করিলেন আলোচ্য ব্যক্তি স্বয়ং—ভিতব বাডী হইতে দরজার শিকলটা নডিয়া উঠিল।

চা প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই সঙ্কেত।

ট্রের পরিবর্ত্তে একখানি কাঠের পীঁড়ির উপব গুটি পাঁচেক চায়ের কাপ লইয়া অমরেশ ফিরিয়া আসিল। অবশ্য সব কয়েকটিকে কাপের মর্য্যাদা দিলে সত্যের অপলাপ হয়, অমরেশের নিজের চা ছিল চটা-ওঠা একটি এনামেলের গ্লাসে, এবং কালো গৌরাঙ্গ ঘরের ছেলের মত বলিয়া তাহার জন্য একটি পিরিচ-বিহীন একাকিনী পেয়ালা।

তবু মহোৎসাহে চা খাওয়া সুরু হইল, বৌদির চায়ের হাতটা যে বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য সে বিষয়ে নতুন করিয়া আর একবার সার্টিফিকেট দেওয়া হইল।

বেলা রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছিল বলিযা তর্কের ঝড ঈষৎ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, প্রবীরের ভৃত্য আসিয়া ডাক দিতেই সভা ভঙ্গ হইল।

সমর সবিদ্রূপ হাস্যে কহিল—যাও নাড়ুগোপাল, বেলা হলে পিত্তি প'ড়ে সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাবে, ননীর শরীর গলে পড়বে—সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ঘুম দাওগে।

জামার আস্তিন গুটাইয়া—সত্যই সোনার মত রঙের সুপুষ্ট বাহুখানি সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া প্রবীর কহিল—গলে পড়বে? এত সহজে নয়, তবে ডিসিপ্লিন ভাঙা আমি পছন্দ করি না।

খোকাকে আবার র‍্যাপারের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই অমরেশ দেখিল পিসীমা বধূকে লইয়া পড়িয়াছেন।

অমরেশকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—ওই যে সোহাগের দেওর এসেছেন, যাও এখন চোখে নোনাপানি ঝরিয়ে লাগাও গে সাতখানা করে?

—কি হ'ল পিসীমা?

—হ'ল আমার পিণ্ডি ছেরাদ্দ। বলি—এত কিসের আস্পর্দ্ধা? পই পই করে বারণ করিনি—রান্নাঘরের কাপড়ে ভাঁড়ারে ঢুকোনা, হাঁড়ি কলসী নেড়ো না—কথা গেরাহ্যি হয় না? খপ্ করে গিয়ে ভাঁড়ারে হাত দিয়ে চিনি নেওয়া? কিসের জন্যে? দফে দফে চা চাই—কেন? এত লবাবি কি জন্যে? দুধ-চিনি অমনি আসে? পয়সা লাগে না?

অমরেশ উত্যক্ত হইয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, আরতি অলক্ষিতে দুই হাত জোড় করিয়া ইঙ্গিতে মিনতি জানাইল। তাহার সপক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র, লাঞ্ছনা বাড়িবে বই কমিবে না।

অমরেশও তাহা না জানে এমন নয়, তাই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—চা আমি করতে বলেছিলাম পিসিমা।

—তা জানি বাছা, তুমি বলবে না তো কি আমি বলবো? আমার 'সই' 'গঙ্গাজল' এলে দুটো পান দিয়েও মান রাখতে যাবে না তোমাদের বৌ তা জানি—কিন্তু তুমিই বা কোন আক্কেলে যখন-তখন চায়ের ফরমাস করে পাঠাও শুনি? বয়েস তো কম হয়নি, বোঝ তো সব, জিনিস তো গাছে ফলে না—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আনতে হয়।

অবশ্য মনে করিবার হেতু নাই যে পিসীমাকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু পিসীমার বাক্য-রচনা প্রণালীই এইরূপ।

শৈশবে মাতৃহারা শিশুদের ভার লইতে তিনি যে দিন এ সংসারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে দিন অমরেশের পিতা অবিনাশ অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—আজ থেকে ছেলে দুটোর সঙ্গে এ সংসারের সব ভারই তোর ওপর পড়ল কেষ্ট, এর ভালোমন্দ দেখতেও তুই, খরচ-পত্তর দেখতেও তুই, তোর বৌদি তো নিজের বোঝা হালকা করে চলে গেলেন।

তদবধি কৃষ্ণবালা এই দুরূহ বোঝাটি মাথায় লইয়া দাদার উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

সেকাল হইলে এবং স্ত্রীলোক না হইলে বোধ করি ইঁহার প্রবল দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত, এবং এই ক্রটিটুকুর জন্যই শুধু সেই প্রবল দাপটের ঝাপটটা খাইতে হয় সংসারের বেচারা কয়টি প্রাণীকে।

কিন্তু আরতিকে যতটা পোহাইতে হয় এমন আর কাহাকেও নহে।

অমরেশকে স্নানের তাগিদ দিবার ছুতায় তাহার ঘরে গিয়া আরতি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—আর একটু হলেই তুমি পিসীমার কথার জবাব দিয়ে বসেছিলে! কী কাণ্ডটা যে হ'ত তা'হলে—লক্ষ্মীটি ভাই একটু সয়ে যেও, অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে।

—ঠিক সেই জন্যেই সয়ে যাই বৌদি, কিন্তু বলতে পারো কেন? কোন্‌কালে অজ্ঞানে কি উপকার করেছিলেন বলে—চিরকাল পদানত হয়ে থাকতে হবে? এ কী 'কর্ত্তার ভূত' এ সংসারের ঘাড়ে চেপে বসে আছে বলতো? কেন মানবো, কেন ভয় করবো, তার কারণ থাকবে না?

পিসী মা যে নিঃশব্দে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কে জানে, সহসা উভয়কে চমকাইয়া দিয়া তাঁহার কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—

—ওগো নাই বা মানলে, নাই বা চিনলে, আমি তো তোমাদের গলগ্রহ হতে এ বাড়ীতে পা দিইনি ? পায়ে ধরে নিয়ে এসেছিল দাদা, তাই এসেছিলাম। এখন মানুষ হয়েছ, বৌদি চিনেছ, বৌদি 'ঠাকুরপো ঠাকুরপো' বলে গদগদ হয়ে কোলের গোড়ায় ভাতের থালা ধরে দিতে শিখেছে, এখন আমায় দরকার কি ? দাওনা, লাথি মেরে দূর করে দাও—মুড়ো খ্যাংরায় ঝেঁটিয়ে আপদ বিদেয় করো—একবেলা একমুঠো আলোচাল, তাও তোমাদের সংসারে অমনি খাইনে, বসে খাইনে, যেখানে গতর খাটাবো সেখানেই পাবো।

ব্যাকুলভাবে আরতি পিসীমার হাত ধরিয়া সানুনয়ে কহিল—দোহাই পিসীমা, আপনার পায়ে পড়ি আমার মাথা খান, চুপ করুন, ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, কি বলতে কি বলেছে—

পিসীমা জিহ্বা ও তালু সংযোগে একটা অবজ্ঞাসূচক ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন —মরে যাই লো, কি আমার ছেলেমানুষ, বয়সে বে হলে, সাতটা ছেলেমানুষের বাপ হতেন। এক পয়সার মুরোদ নেই, চব্বিশঘণ্টা গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর খোকার মতন 'বৌদি বৌদি' করে সাতবার রান্নাঘরে উঁকি দিচ্ছেন, তাই ছেলেমানুষ, কচি খোকা! তাও বলি বৌমা—তোমারই বা অতবড় দেওরের সঙ্গে হরঘড়ি এত ফুসফুস গুজগুজ কিসের ? কথায় বলে—সোমত্ত ছেলে-মেয়ে আগুন আর ঘী, শাস্তর তো আর গায়ের জোরে মিথ্যে হয়ে যাবে না।

অমরেশ কথার প্রারম্ভেই চলিয়া গিয়াছিল, আরতিও ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

—যাই, ওদের ছোট বৌটা আমার হাতের কৎবেলের আচার খেতে চেয়েছিল, দিয়ে আসি এক ফোঁটা—বলিয়া পিসীমা 'ওদের বাড়ীর' উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

প্রবীর বাড়ীর ভিতর পা দিতেই মন্দিরা অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—বারে দাদাভাই, তুমি এত বেলা করলে যে বড় ? আমার বুঝি খিদে পায় না ?

—খিদে পেয়েছিল, খেয়ে নিলেই পারতিস, আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দিয়ে যাইনি তো ?

ত্রুটি স্বীকারের পরিবর্ত্তে প্রবীরের মুখে এইরূপ হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া অভিমানিনী মন্দিরার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে আদরিণী, সর্ব্বদা সকলে তাহাকে আদর করিবে ইহাই এ বাড়ীর রীতি, তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ।

প্রবীর একবার ভাবিল ক্ষমা প্রার্থনার ছুতা করিয়া একটু আদর করিয়া যায় কিন্তু মনটা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল তাই সাবান-তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া গেল।

প্রবীরের মা জ্যোতির্ময়ী দেবী যতীন মুখুজ্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিবাহের বৎসরখানেক পরেই একটি সন্তান প্রসব করিয়া তিনি সেই যে ইস্তফা দিলেন, ষষ্ঠীদেবী আর তাঁহার পাত্তা পাইলেন না।

অনেকে তাঁহাকে নিঃসন্তান বলিয়াই মনে করে, প্রশ্ন করিলে তিনিও হাসিয়া বলেন—পাগল, আমার আবার ছেলে কই? ছেলেমেয়ে সবই ওপক্ষের।

তাছাড়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ ও অটুট স্বাস্থ্য দেখিলে প্রবীরের পিঠোপিঠি দিদি বলিয়া ভ্রম হয়। অসময়ে যতীন মুখুয্যে যখন পাকাচুলের উপর টোপর চাপাইলেন, ঘরে-পরে সকলেই চোখ টেপাটেপি করিয়াছিল, কিন্তু বৌ দেখিয়া সকলের চোখের তারা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এমন রূপ দেখিলে যে বুড়ারও মাথা ঘুরিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়,একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে সতীরাণী জ্যোতির্ময়ীর চাইতে বয়সে বেশ কিছু বড়, তাহারই দৌহিত্রী এই মন্দিরা। অনেকগুলি ভাইবোনদের ভিতর হইতে একটিকে শৈশবাবস্থাতেই জ্যোতির্ময়ী চাহিয়া লইয়াছিলেন—মানুষ করিবার সখে, মন্দিরা অনেকদিন অবধি তাঁহাকে নিজের মা বলিয়াই বিশ্বাস করিত।

এ বাড়ীতে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য।

যতীন মুখুয্যে কারবারি লোক, স্নানাহারের নিয়ম যথাযথ মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে কাজকর্ম্ম দেখাশোনা করিতে হয়। ইদানীং ধুয়া তুলিয়াছেন বটে প্রবীর সব বুঝিয়া লউক, কিন্তু প্রবীর সভয়ে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ে। বাবা, বাবার অফিস, বাবার হিসাবের খাতা—এমন কি দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে পর্য্যন্ত সে সমান ভয় করে।

ছোট অতীন মুখুয্যে উকিল মানুষ, তাহার সব নিয়ম বাঁধা। তস্য গৃহিণী অক্লণপ্রভাও তাই। প্রায় আধ-কুড়ি সন্তান সন্ততির জননী হইয়াও তিনি ডিসিপ্লিন রক্ষা করিয়া চলেন। মেদ বাহুল্যে নীচে নামা কষ্টকর বলিয়া তাঁহাদের টেবিল পড়ে উপরেই। বয়সে ছোট অথচ মান্যে বড়, বড় জায়ের সহিত ঠিক কোন সম্পর্ক রাখিয়া চলা উচিত সেটা বুঝিতে না পারার জন্যই বোধ করি উক্ত গোলমেলে বস্তুটিকে সযত্নে আজও পরিহার করিয়া চলেন।

আহারের স্থানে মন্দিরাকে না দেখিয়া জ্যোতির্ময়ী বিস্মিত হইলেন। ঢিলে পায়জামার উপর হাফ্‌সার্ট চাপাইয়া আঁচড়ানো চুলের উপর সাবধানে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রবীর আসিয়া কহিল—কই, তৃতীয় ব্যক্তিটি কই?

—তাই তো দেখছি, আমি বলি দু'জনেই আসছিস বুঝি একসঙ্গে।...ও শ্রীপতি, দেখতো বাবা দিদিমণি কোথায় গেল।

প্রবীরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না মন্দিরার রাগ ভাঙে নাই। হাসিয়া কহিল—রোসো মা, আমি ডেকে আনছি, খুকুমণি বিষম চটেছে।

পড়ার ঘরে একখানি ইতিহাসের বই খুলিয়া মন্দিরা গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল, প্রবীর তাহার ধ্যাননিরত মূর্ত্তি দেখিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মন্দিরা অবশ্য ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই কিছুমাত্র না চমকাইয়া ধীরভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইল।

হাতের বইখানা টানিয়া লইয়া প্রবীর কহিল—নাতনি, রাগটা কি খুব বেশী?

—আঃ! ভাল হবে না বলছি, বই দাও।

তাহারই অনুকরণ করিয়া প্রবীর কহিল—বারে তুমি এখন বই পড়বে, আর আমার বুঝি খিদে পায়না?

—খিদে পায় খেয়ে নাওগে না—আমার সঙ্গে এক টেবিলে খেতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেই।

—হয়েছে, আমার অস্ত্রে আমাকে সংহার। বেশ এখন কান মুলছি, মানভঞ্জন হোক।

হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর। অতএব মুখটা আরো ভারী করিতে হয়।

—বাঃ চমৎকার হাঁড়িমুখ করতে পারোতো—ফার্ষ্ট প্রাইজ পাবার যোগ্য, কিন্তু চল্ এখন খেয়ে নিবি, মা অনেকক্ষণ বসে আছেন। শোন্ তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। একটা কাজ করতে হবে তোকে।

বিবাদ ভুলিয়া মন্দিরা সোৎসুকে কহিল, কি?

—বলছি পরে।

—না, এখনই বল।

—এখন বলব না।

—না, এখুনি শুনবো।

—আহ্লাদী! আচ্ছা অমরেশকে চিনিস তো?

—চিনি না আবার? আগে তো সে-ই কত আসতো ক্যারম্ খেলতে। বিশ্রী রকমের ভাল খ্যালে, সকলকে হারিয়ে দেয়, সেই জন্যেই তো আর খেলি না।

—ওদের বাড়ী বেড়াতে গেলে পারিস।

—কী দায় পড়েছে? যা ওর পিসী, বাব্বা! গঙ্গা নাইতে যায় আর রাস্তার ছেলেদের যা-তা গালাগাল দিতে দিতে যায়, কে যাবে ও বাড়ী?

—ওর বৌদি কিন্তু খুব ভালো মেয়ে, একটু গল্পটল্প করবি গিয়ে—কিংবা ডেকে এনে মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেও পারিস।

—হঠাৎ?

—এমনি, বেচারা বড় দুঃখী। সত্যি আমাদের বাঙালীর ঘরের মেয়েরা মুখ বুজে কত কষ্ট সহ্য করে কেই বা তার সন্ধান রাখে?

—খুব বুঝি কষ্ট, দাদাভাই?

—কষ্ট? তাই তো মনে হয়—কেমন অন্যমনস্ক ভাবে প্রবীর যেন নিজের উদ্দেশেই কথা কয়, মেয়েরা কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করে কেমন করে দেখতে ইচ্ছা করে তার।

—দিদিমণি, মা বলছেন আপনারা কি আজ খাবেন না?

শ্রীপতি আসিয়া তলব দিল।

—যাচ্ছি যাচ্ছি, চল।

ব্যাপক অর্থে 'ও বাড়ী' অর্থাৎ কালো গৌরাঙ্গ ও অমরেশদের বাড়ী।

পরিহাসের সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যায় না—কিন্তু গৌরাঙ্গের নামকরণকালে যিনি উক্ত কাজের ভার লইয়াছিলেন পরিহাস প্রবৃত্তিটা তাঁহার তখন বোধ করি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাজেই সম্বোধন কালে কেমন করিয়া যেন গৌরাঙ্গ নামের পূর্ব্বে একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিল। শিশুকাল হইতে গৌরাঙ্গ উক্ত উপসর্গটি অগ্রে লইয়া সংসারে চরিয়া বেড়াইতেছে।

অমরেশের বাড়ীর এক দেয়ালেই ইহাদের বাড়ী। এ বাড়ীও কম জীর্ণ নয়, কিন্তু একতলা বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্কর দেখায়। পুরুষানুক্রমে এই দুইটি পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে।

সদ্ভাব আছে বলিয়াই যে বিবাদের অভাব আছে এমন নয়। কখনো দুই পরিবারে কথা বন্ধ হইয়া যায়, মুখ দেখাদেখি থাকে না, দুই বাড়ীর যাতায়াতের সহজ পথটায় তালা-চাবি পড়ে, ছোট ছেলেদের ঠ্যাং ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া অপর পক্ষের এলাকায় যাওয়া নিবারণ করিতে হয়, বাড়ীর মেয়েরা শ্রুতিগোচর স্থান হইতে শুনাইয়া শুনাইয়া ও পক্ষের নিন্দাবাদ করে, বাড়ীর পুরুষরা গলির মোড়ে দেখা হইলে না-দেখার ভান করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া সরিয়া পড়ে।

আবার এক সময়—সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মাঝের দরজার তালাচাবি খুলিয়া যায়, মেয়েরা অন্তরঙ্গ সখীত্বে গদগদ হইয়া আলাপ করে, ছোট ছেলেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, পুরুষরা ধীরে ধীরে এ বাড়ীর তাসের আড্ডায় আসিয়া উঁকি দেয়।

ছোটরা বড় হয়, বড়রা বুড়া হইয়া পড়ে, বধূরা গৃহিণীপদ পায় গৃহিণীদের শিথিল-মুষ্টি হইতে রাজ্যপাট খসিয়া পড়ে। সকলের শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার সমান নয়, এক একজনের আমলে এক এক রকম ভাবের আদান প্রদান চলে।

বর্ত্তমানে উভয় পরিবারে বিশুদ্ধ বাংলায় যাহাকে বলে—গলায় গলায় ভাব।

মাঝের দরজাটা খুলিয়া কেষ্টবালা কণ্ঠে মধু ঢালিয়া কহিলেন—অ ছোট বৌ, কই গা কোথায়?

ছোট বৌ অর্থাৎ গৌরাঙ্গর মা ত্রস্তব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন—ঠাকুরঝি ডাকছো নাকি?

—এই যে একফৌটা কংবেলের আচার এনেছিলাম, বলি পোয়াতি মানুষ মুখ ফুটে সেদিন বললি।

ছোট বৌ লজ্জিত ভাবে হাত পাতিয়া পাথরবাটিটা লইয়া কহিল—তোমার যেমন বাতিক,

বলেছিলাম বলেই অমনি ছুটে দিতে এসেছ? আর ভাই বুড়ো বয়সে এই সব কাণ্ড, লজ্জায় মরে যাচ্ছি, এখন আর—

—মরণ আর কি, তোরাও যদি বুড়ো হলি তা'হলে আমরা কোথায় আছি লো? এই তো কাচ্চা বাচ্চা পাঁচটা হবার বয়েস।

সাতটি সন্তানের জননীর পক্ষে এতটা ভালবাসা বরদাস্ত করা শক্ত, তবু তোষামোদের মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ ছোট বৌ গলিয়া গিয়া কহিল—আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরঝি, আর না। আমার গোরা এই ষেঠের কোলে পঁচিশে পা দিলো, এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ আনবো কবে তাই ভাবছি, মাঝখান থেকে আবার এই—

—তা হোক, এয়োস্ত্রী মানুষ ও কথা বলতে নেই। তা গোরার বিয়ের কি করছিস?

—আর বিয়ে! ছেলে তো একেবারে ঝাড়া জবাব দিচ্ছে বিয়ে করবে না বলে। কি যে এখনকার ফ্যাসান হ'ল!

—ও মা! বিয়ে করবে না কি? ছেলে বললেই শুনতে হবে? জোর করে দিবি। উচকা বয়েস, বিয়ে না করে স্বভাব চরিত্তির ঠিক রাখতে না পারলে? কোনদিন কি বদনাম শুনবি, তখন ঘেন্নায় মরে যাবি।

নিজের সন্তান সম্বন্ধে এ হেন আলোচনাটা শ্রুতিমধুরও নয়, গৌরবজনকও নয়। গৌরাঙ্গ-জননী নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল—তোমরা সব বলে কয়ে দেখনা ঠাকুরঝি, আমায় তো ছাই মানে।

—বলবো, একেবারে মেয়ে নিয়েই বলবো—গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ে দেখেছি সেদিন, খাসা ছিরি ছাঁদ, সন্ধান নিয়ে দেখলাম তোদেরই পালটি ঘর। বড় বৌকে নিয়ে একদিন যাবো তাদের বাড়ী গঙ্গাচানের ছুতোয়।···কই কোথায় গেল বড় বৌ?

—দিদি এই গেলেন ছাতে, চারটি বড়ি দিতে।

—বড়ির কথা আর বলিসনে ছোট বৌ, বারো আনা এক টাকা সের ডাল, চোদ্দ আনায় এমনি এতটুকু একটা ছাঁচি কুমড়ো—কোত্থেকে খাবি বড়ি?

—তা যা বলেছ ঠাকুরঝি,—প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তনে ছোট বৌ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

—আর আমাদের বাড়ীর নবাব নন্দিনীটি হয়েছেন তেমনি—দুটো ডাল ভাত সেদ্ধ করতেই তাঁর দিন কেটে যায় তো বড়ি আচার করবে কখন? আমি বুড়ো মাগী যদি করলাম তো হ'ল।

ছোট বৌ সোৎসাহে কহিল—হরি বল, ওইটুকু সংসারের রান্না, তাতেই বৌমা সময় পায় না? আমাদের মতন হলে টের পেত। হ্যাঁ ঠাকুরঝি, অখিল নাকি সত্যিই সন্ন্যাসী হবে?

—কি জানি ভাই। ছেলের ধরন ধারণ দেখলে তো গায়ে জ্বর আসে। ওই পুজো-আচ্চা জপতপ নিয়েই আছে, বলে নাকি চাকরীও ছেড়ে দেবে।

গোপন করিবার কারণ না থাকিলেও ছোট বৌ ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—আচ্ছা ঠাকুরঝি, বৌমার সঙ্গে বুঝি তেমন 'ইয়ে' নেই? নইলে—ব্যাটা ছেলে, সোমত্ত বয়েস, অমন সোনার প্রতিমা ঘরে থাকতে ধম্ম ধম্ম বাতিক কেন?

তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া কৃষ্ণবালা কহিলেন —তবে আর বলছি কি? মেয়েমানুষ, একটু নেটিপেটি একটু গায়েপড়া ভাব দেখা—চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে থাক্, কান্নাকাটি কর—তা না ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেড়াচ্ছে। পোড়ার মুখে হাসিরও কামাই নেই এক দণ্ড।

ছোট বৌ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কে জানে কেমন মন, আমরা তো এই বুড়ো হয়ে মরতে যাচ্ছি, তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি তোমার কাছে—একদিন এদিক উদিক হবার জো নেই।

—তবে? তোরাই বল্? ওই সর্ব্বনাশীর খিষ্টানী মেজাজের গুণেই বাছা আমার বৈরাগী হ'ল—বলিয়া কৃষ্ণবালা চোখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিলেন।

—ওখানে কে?

—উঠানের ওপার হইতে সমরের বিধবা দিদি উষারাণী উত্তর করিল—আমি গো কেষ্টপিসী। তুমি কতক্ষণ?

কেষ্টবালা ইহাকে দেখিতে পারেন না—স্পষ্টবক্তা বলিয়া ইহার দুর্নাম আছে।

উত্তরে মুখটা ঘুরাইয়া অবহেলার ভঙ্গীতে কহিলেন—আমার আবার দিন ক্ষণ, সর্ব্বক্ষণই আসছি যাচ্ছি, তোমাদেরই সেজে গুজে বেড়াতে আসা।

উষারাণী গায়ের র‍্যাপারটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া কহিল—এই একাদশী নইলে তো সময় হয় না—ভাবলাম যাই একবার এ-বাড়ী ও-বাড়ী বেড়িয়ে আসি, বেলা ছোট হয়েছে তেমনি, এক মিনিট সময় পাবার জো নেই।

—কি জানি মা তোমাদের কিসে এত সময়ের অভাব। এই তো সকাল বেলা গঙ্গায় গেছি, আহ্নিক পুজো করেছি—

উষারাণী বাধা দিয়া কহিল—তোমার তো বাবু বৌটিই সংসারের সব কাজ করে—তুমি আর সময় পাবে না কেন?

কৃষ্ণবালা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তোরা তো তাই দেখিস? কথায় বলে না—"ছুঁড়ির তরে সোনার বাটা বুড়ির তরে মুড়ো ঝাঁটা"—বৌ যদি হেঁটে যায় তো পাঁচ আবাগীর বুকে বাজে, আর আমি বুড়ো মাগী দিনরাত চাকরাণীর মত খাটছি চোখখাগীদের চোখে পড়ে না।

উষারাণী এ পাড়ার বৌ নয়, ঝিউড়ি মেয়ে, অতএব গায়ে-পড়া গালি-গালাজ সহ্য করিয়া যাইতে রাজী হইল না।

বিদ্রূপ হাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া কহিল—দুগ্‌গা দুগ্‌গা, সকাল বেলা কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—ভর দুপুরে চোখের মাথা খেয়ে মলাম।

ছোট বৌ খণ্ড প্রলয়ের আভাসে ভীত হইয়া কহিল—ও কি কথা উষা, ছি! ঠাকুরঝি তো তোমার নাম করে বলেন নি কিছু।

—নাই বা বললেন, ঘাসের বিচি তো খাই না, বুঝি সবই। বৌটাকে যা সুখে রেখেছেন তা তো আর কারুর জানতে বাকী নেই, বললেই দোষ।

অতঃপর কৃষ্ণবালাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইল।

পাড়ার লোকের কুমন্ত্রণাতেই যে বৌ বিগড়াইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়া সগর্জ্জনে কহিলেন—তাঁহার ছাগল তিনি ল্যাজের দিকে কাটিলেই বা কাহার কি আসিয়া যাইতেছে?—কথায় কথায় আরো কথা বাড়িল।

উষারাণীর একটি আধটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও কৃষ্ণবালার প্রবল গালি-গালাজের শব্দে শীতের দুপুরের অখণ্ড শান্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

বড় বৌ বড়ির ডালবাটা মাথা হাত লইয়া নামিয়া আসিলেন। বড়-বৌয়ের বিবাহিতা কন্যা মেনকা চিঠির প্যাড্ চাপা দিয়া রঙ্গস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

আশপাশের অনেক বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, জানলায়, সুন্দরীদের সকৌতূহল মুখপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। একটা মুখরোচক আলোচনার সুযোগ পাইয়া সকলেই যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না, তাহাদের তৃপ্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া।

এমনি করিয়াই ইহাদের দিন কাটে।

আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা নাই, দিনের পর দিন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

সরু গলির মধ্যে গায়ে গায়ে লাগা ঘিঞ্জিবাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল ভেদ করিয়া বাতাস উদারতার বাণী বহিয়া আনেনা, আকাশ আলোর আমন্ত্রণ পাঠায় না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, দিনের হিসাবে আসা যাওয়া করে মাত্র।

মানুষের পঙ্কিল নিঃশ্বাসে মানুষের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

বঞ্চিত বলিয়াই ক্ষুধাতুর ঈর্ষায় পরস্পরকে আঘাত করে।

অল্প লইয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিয়াই অত্যল্পের জন্য হানাহানি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান রাখে না বলিয়াই অন্তরের দৈন্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে লজ্জা বোধ করে না।

তবু ইহারই মধ্যে চলিতে থাকে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের চিরন্তন লীলা, যুবক-যুবতীর প্রেমের খেলা।

পতিগৃহ-বঞ্চিতা মেনকা প্রত্যহ অশুদ্ধ বানান আর অপূর্ব্ব হস্তাক্ষর সম্বলিত দীর্ঘ প্রেমপত্র রচনা করিয়া নিত্যনূতন লোক ধরিয়া স্বামীর ঠিকানা লিখাইয়া পাঠায়।

অখিলেশ মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

বিজয় মল্লিক দেশোদ্ধার করে।

ঘড়িতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে

ব্ল্যাক-আউটের মহিমায় কলিকাতা নগরীকে আর চিনিবার উপায় নাই। বিমুখ রাজ্য-লক্ষ্মীই যেন প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে গিয়াছেন। রাত্রির কলিকাতা, ভাগ্য-দেবতার পাদপীঠে যে অজস্র দীপমালার অর্ঘ্য সাজাইয়া আরতি করিত, দেবতার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সে মালা খসিয়া পড়িয়াছে।

তাই আজ ঘরে বাহিরে এত অন্ধকার।

মানুষ আর পথ দেখিতে পায় না।

শীতের রাত্রে সচরাচর এমন সময় পাড়া নিশুতি হইয়া পড়ে, অন্ধকারের জন্য আজকাল আরো তাড়াতাড়ি লোকে পথের কাজ সারিয়া আপন আপন আস্তানায় আশ্রয় লয়। যে অসংখ্য লোক ফুটপাথে পড়িয়া রাত্রি কাটাইত, তাহাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

কদাচিৎ এক-আধটা মানুষ আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে মুড়ি দিয়া, বেসুরা সুরে সিনেমার গানের এক-কলি গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—বোধকরি ভয় ভাঙিতে।

দৈবাৎ এক-আধটা গরুরগাড়ী কপি বেগুন বোঝাই দিয়া চলিয়াছে বাজারের অভিমুখে।

জানলা দিয়া শীতের কন্‌কনে হাওয়া আসিয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ছুঁচের মত বিঁধিতে-ছিল, তাই কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া আরতি সরিয়া আসিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিল।

বিছানায় বসিতে ভয় করে, সারাদিনের শ্রমক্লান্ত শরীর যদি বিছানার প্রলোভনে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বসে। অখিলেশ এখনও গুরু-আশ্রম হইতে ফিরে নাই, কড়া নাড়িলে দুয়ার খুলিয়া দিতে হইবে। বই থাকিলে সময়টা জলের মত কাটিয়া যায়, আজ একখানিও বই নাই।

আরতি মনে মনে ভাবে আবার কাল ঠাকুরপোকে খোসামোদ করিয়া খানকয়েক বই আনাইতে হইবে। কোথায় বা পায় বেচারা! আগে লাইব্রেরী হইতে আনিয়া দিত, কিন্তু অখিলেশের নিষেধে লাইব্রেরীর বই বন্ধ হইয়া গিয়াছে! অসার উপন্যাস পড়িয়া উচ্ছন্ন যাইবার জন্য অর্থ নষ্ট করা নাকি অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার।

অমরেশ বই আনিয়া দেয় লুকাইয়া, আরতি লুকাইয়া পড়ে। এই একটি বিষয়ে সে বিবেকের বিরুদ্ধে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়। দীর্ঘদিন কাটিয়া যায় সংসারের তুচ্ছ কাজে, কিন্তু দীর্ঘ রাত্রি কাটিবে কি লইয়া?

কৃষ্ণবালা এক ঘুম হইতে উঠিয়া আরতির ঘরে উঁকি মারিয়া ঘুম-ভাঙা ভারী গলায় কহিলেন—অখিল এখনও বাড়ী আসেনি?

আরতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—হুঁ—বলিয়া একটিমাত্র শব্দে অখিলেশের অবিবেচনার সমস্ত অপরাধ নির্দ্দোষ আরতির স্কন্ধে চাপাইয়া তিনি সরিয়া গেলেন। অধিক কথা কহিলে ঘুমের আমেজ ভাঙিয়া যাওয়ার ভয়েই বোধ করি ফাঁড়াটা অল্পে কাটিল।

অখিলেশ আসিল সাড়ে বারোটায়।

বিদ্যুতের আলোর ব্যবহার নাই, হ্যারিকেন ধরিয়া স্বামীকে সিঁড়ি পার করাইয়া দ্বিতলে উঠাইয়া দিয়া আরতি আবার নীচে নামিয়া আসিল।

অখিলেশের রাত্রের আহার্য্য ফল, দুধ ও মিষ্টান্ন নীচে গোছান আছে। আনিতে হইবে তসরের শাড়ী পরিয়া। আহার্য্যের শুচিতায় অখিলেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কাঠকয়লার আঁচে দুধ গরম করিয়া, আসন জল প্রভৃতি আনিয়া নামাইতেই অখিলেশ গম্ভীরভাবে কহিল—রাতের খাওয়াটা এবার থেকে ছেড়ে দেব মনে করছি।

আরতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিল।

—না না, তোমার কিছু দোষ হয়নি, আমার জন্যে যে কেউ অকারণ কষ্ট পায় এটা আমি পছন্দ করি না।

আরতি শান্তকণ্ঠে কহিল, কে বললো কষ্ট হয় ?

তা কষ্ট হয় বৈকি। দেখেই বোঝা যায়।

আরতি মৃদু হাসিয়া কহে, এসব তুচ্ছ জিনিস বুঝতে পারো তুমি ?

—এ ধরণের মান অভিমানের পালা না গাওয়াই ভালো। বলিয়া অখিলেশ খাবারের থালাটা টানিয়া লইল।

আরতি ধীরে ধীরে কহিল—শীত বেশী পড়েছে, পিসীমা বলছিলেন ঠাণ্ডা লাগে, একটু সকাল করে আসতে পারলে—

—এর চেয়ে আগে আসা সম্ভব নয়, গুরুদেব বলেন—সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে রাত্রি। গৃহস্থাশ্রমে থেকে অবশ্য কিছুই হয় না।

আরতির এবার ইচ্ছা হইল বলে—এ আশ্রমটা ছাড়িলেই তো পারো—কিন্তু প্রতিবাদ না করিয়া এমনই অনভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, কিছু বলিতে তাহার যেন মন ওঠে না।

আহারান্তে আরতির শয্যার প্রতি একবার দৃষ্টি পড়িতেই অখিলেশ কহিল—খোকা কই ?

—সে আজ তার কাকার কাছে শুয়েছে।

সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিক কথা কওয়া নিষেধ, তাই অখিলেশ আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া আপনার শয্যায় আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

আরতি আলো নিভাইবে, দুয়ার দিবে, আশ্রয় লইবে আপনার একক শয্যায়। শিশুর উষ্ণতা তবু বিছানাটাকে সহনীয় করিয়া রাখে, আজ মনে হইতেছে কে যেন জল ঢালিয়া রাখিয়াছে তাহার শয্যায়—এমনিই হিমেল ঠাণ্ডা।

উভয়ের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে ক্রমশঃ ঘরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, একসময় ঘুম আসেই—হয়তো ঘুমাইয়া উভয়েই স্বপ্ন দেখে মুক্তির।

॥ তিন ॥

বিজয় মল্লিক রিলিফ কমিটি গঠন করিতেছে।

বোমায় যাহারা মারা গিয়াছে বা যাইবে তাহাদের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার লইবে বিজয় মল্লিক।

তাই বিজয় মল্লিকের স্বাচ্ছন্দ্য ঘুচিয়াছে। বেচারা জন্মদুঃখী। বন্যায়, মহামারিতে, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, যত সমস্যার সৃষ্টি হয় বিজয় মল্লিকের মস্তিষ্ক সেই দুষ্পূরণীয় সমস্যার পূরণের চেষ্টায় খাটিয়া মরে। যত লোক মারা পড়ে, প্রত্যেকের জন্য শোকগ্রস্ত হয় তাহার মন।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বিজয় মল্লিকের নাওয়া খাওয়ার অবকাশ ছিল না। বাঁধ-ভাঙা নদীস্রোতের মত অকস্মাৎ যে নরদেহধারী প্রেতের দল একটি মাত্র 'মাটির হাঁড়ি'র ভরসায় কলিকাতার রাজপথে জীবনযুদ্ধে নামিয়াছিল, তাহাদের ভাল করিবার দুশ্চেষ্টায় বেচারার দিন-রাত্রের ঘুম ঘুচিতে বসিয়াছিল।

অকস্মাৎ যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, অকস্মাৎই তাহার অবসান ঘটিল। যুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচিত এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তাহারা সহসা ছায়াবাজির মত কোথায় মিলাইয়া গেল, কেন গেল, তাহার সম্যক্ রহস্যের সন্ধান অজ্ঞাত থাকিতে থাকিতেই পড়িল বোমা।

কলিকাতার লোকের স্নায়ু সবল হইয়া গিয়াছে। যাহারা একদা রেঙ্গুনে বোমা পড়ার গল্প শুনিয়া প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে জ্ঞান হারাইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল, তাহারাই এখন ফুলকপি আর ভেট্‌কী মাছের থলি দোলাইতে দোলাইতে বাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীতে বোমা পড়ার বিবরণ লইয়া খোশগল্প করে।

শুধু বিজয় মল্লিকের মত যাহারা জন্মদুঃখী তাহাদেরই আবার একটা নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

বোমাহত দুর্ভাগাদের দুঃস্থ স্ত্রীপুত্রের জন্য বিজয় মল্লিক রিলিফ কমিটি গড়িতেছে।

অমরেশ নিজের ইচ্ছায় যোগ দেয় না—দেয় বিজয় মল্লিকের তীক্ষ্ণ শ্লেষে, নিদারুণ ধিক্কারে। চাঁদার খাতা হাতে লোকের দরজায় দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়, তবু বিজয় তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়ায়।

এইখানে আছে অমরেশের দুর্ব্বলতা।

সেদিনও বৈকালে অমরেশ তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছিল কমিটির মিটিঙের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সহসা গলির মোড়ে ধাক্কা খাইতে-খাইতে বাঁচিয়া গেল মন্দিরার সঙ্গে।

মোড়ের মাথায় মন্দিরাদের বাড়ী বটে কিন্তু গলির ভিতরে কখনো পদার্পণ করিতে দেখা যায় না তাহাদের—তাই অমরেশ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

ভারী অদ্ভুতভাবে হাসে মন্দিরা, অকারণ এমন ভঙ্গীতে হাসে, মনে হয় যেন কী এক গোপন রহস্য লুকানো আছে তার হাসির আড়ালে।

হয়তো টুকটুকে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরা ঈষৎ উঁচু দাঁত দু'টির জন্যই এইরূপ দেখায়।

—অমরেশ দা, চিনতে পারছেন না বুঝি?

—পারবো না কেন, বাঃ।

—বেরিয়ে যাচ্ছেন বুঝি? আপনাদের বাড়ীই যাচ্ছি।

—আমাদের ভাগ্য। চল।

ছেলেবেলায় যাহাকে ফ্রক্ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে তাহাকে আপনি বলিতে কেমন আড়ষ্ট লাগে।

—কই জিগ্যেস করলেন না তো কেন যাচ্ছি?

—প্রশ্নের উত্তর তো আমি নিজেই দিলাম, আমাদের ভাগ্য।

—আপনি বড় বাজে কথা বলেন, যাচ্ছি বৌদির সঙ্গে ভাব করতে।

বৌদির কথা মনে পড়িতেই অমরেশ অস্বস্তি বোধ করে, হয়তো বেচারা একখানা-আধ-ময়লা মোটা শাড়ী পরা অবস্থায় রান্নাঘরে বন্ধ আছে, নয়তো পিসীমার কাছে বকুনি খাইতেছে, এমন ফিট্‌ফাট্ কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে দেখিয়া আপনার দৈন্যে কতই বিব্রত বোধ করিবে হয়তো।

অমরেশকে বিমনা দেখিয়া মন্দিরা চলিতে চলিতে গতি মন্থর করিয়া কহিল—আপনি বুঝি রাগ করলেন?

কেন?

—আপনাদের বাড়ী যাচ্ছি বলে?

—কী আশ্চর্য্য! এ কি একটা কথা হ'ল?

—তবে কথা কইছেন না যে?

অমরেশ হাসিয়া ওঠে।—আমাদের বাড়ীই তো যাচ্ছো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দরকার?

যাওয়াটা আপনি এপ্রিসিয়েট্ করেন কি-না সেটাও দেখা দরকার তো?

—যাচ্ছো তো বৌদির সঙ্গে ভাব করতে?

—আপনার সঙ্গে করবো না বলেছি?

অমরেশের বুঝিতে বিলম্ব হয় না ফ্রক্ ছাড়িয়া শাড়ী ধরিলেও বড় হইতে ইহার এখনো বাকী আছে। গৃহস্থঘরের সুখ দুঃখে মানুষ হওয়া মেয়েরা অবশ্য এ বয়সেই যথেষ্ট পরিপক্ক হইয়া ওঠে, কিন্তু ধনীর ঘরের আদরের দুলালীদের বয়স বাড়ে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে।

—আচ্ছা দেখা যাবে মতের পরিবর্ত্তন হতে কতক্ষণ লাগে।

—কেন, আপনি বুঝি কারুর সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন না?

—বরং উল্টো।

—না না, আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা আছে, আগে তো কত যেতেন, এখন আর যান না কেন?

—কেন, বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, কিন্তু দরকারি কথাটা কি শুনি ?

—আপনাদের রিলিফ কমিটির মেম্বার হবো আমি।

—তুমি !

—কেন আমি কি মানুষ নই ? পরোপকারটা বুঝি ছেলেদেরই একচেটে ? মেয়েদের শরীরে বুঝি দয়াধর্ম্ম থাকতে পারে না ?

—খুব পারে, কিন্তু বাড়ীতে এ্যালাউ করবেন ?

—ইস্!

এই একটিমাত্র সগর্ব্ব উক্তিতে নিজের প্রতিপত্তির প্রমাণ দিয়া মন্দিরা অমরেশের সন্দেহের নিরসন করিয়া দিল।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আলোচনা স্থগিত থাকিল। পথ চলিতে চলিতে কৌতুক আলাপে যে পুলকের আমেজে ভারাক্রান্ত মনটা লঘু হইয়া আসিয়াছিল, বাড়ীর দরজায় আসিয়া তাহা লোপ পাইল অমরেশের।

সহসা মনে হইল বাড়ীটা বড় বেশী জীর্ণ, ভিতরে দৈন্যের ছবি বড় বেশী নগ্ন। নিজেদের এই শ্রীহীন সাজ-সজ্জা যে এতদিন চোখে পড়ে নাই কেন সেইটাই আশ্চর্য্য লাগে।

উঠানের দেওয়াল ভরিয়া পিসীমা গোবর কুড়াইয়া আনিয়া ঘুঁটে লাগাইয়াছেন। দালানের আধখানা জুড়িয়া কয়লার গুঁড়ার গুল, পোড়া কয়লা, নারিকেলের ছোবড়া আর ডাবের মালায় ভর্ত্তি। সিঁড়ির দেওয়ালে দড়ি টাঙাইয়া ভিজা কাপড় মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, শোবার ঘরে বস্তাবন্দী করিয়া সংগ্রহ করা আছে চাল, ডাল, আটা—ভবিষ্যতের খোরাক।

এসব পিসীমার রাজ্য, কোন জিনিস এতটুকু এদিক-ওদিক করিবার জো নাই, ঘর বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার চেষ্টাকে তিনি খৃষ্টানীপনা বলিয়া ঘৃণা করেন।

—আমাদের বাড়ী ঢুকলে বেশীক্ষণ বসবার ইচ্ছে হবে না।

সরল দৃষ্টি তুলিয়া মন্দিরা সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল—কেন ?

—এত অপরিচ্ছন্ন ! গরীবের ভাঙ্গা কুঁড়ে।

—আচ্ছা বেশ, জানলাম আপনি বিনয়ের অবতার, কিন্তু বৌদি কই ? ও বৌদি, আমি আপনার সঙ্গে ভাব করতে এলাম, আর আপনি বেরোচ্ছেন না ?

আরতি নূতন কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া রন্ধনশালা হইতে উঁকি মারিতেছিল, ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিল। মন্দিরা যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন নয়, ছাদে দাঁড়াইলে 'লাল বাড়ী'র অনেক কিছুই দেখা যায়, মানুষগুলিও প্রায় মুখ চেনা, কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে তাহাদেরই এই মেয়েটিকে দেখিয়া সে একটু অবাক হইয়া গেল।

—কি আপনিও রেগে যাচ্ছেন বুঝি ? অমরেশ দা তো রাগ করে কথাই বন্ধ করে দিলেন।

আরতি মৃদুহাস্যে তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এমন মুখ্যু কেউ আছে নাকি ? খুব আনন্দ হচ্ছে আমার, প্রবীর ঠাকুরপোর ভাগ্নী তো তুমি ?

—ভাগ্নী হতে যাবো কি দুঃখে ? নাতনী—নাতনী। আমার মা হচ্ছেন গিয়ে ভাগ্না।

—ওঃ তা'হলে তো আমাদের সঙ্গেও সম্পর্কটা খুব মিষ্টি হ'ল।…যাও ঠাকুরপো, ওপরে নিয়ে গিয়ে বসাওগে।

—কেন আপনি ?

আমিও যাচ্ছি ভাই, রান্না চাপিয়েছি—ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দেয় আরতি।

—তবে চলুন রান্নাঘরেই বসা যাক্, শীতকালে রান্নাঘর বেশ মজার জায়গা। আপনার ঠাকুরপোর সঙ্গে ওপরে গিয়ে বসে থাকতে দায় পড়েছে আমার।

অমরেশ ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সুরে কহিল—একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে, "নদী পার হয়ে নৌকায় লাথি"—কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।

—আহা আপনি যেন কাণ্ডারী হয়ে আমায় নদী পার করে আনলেন। কোন দিন তো বলেনও নি বেড়াতে আসতে।

আরতি তাহার কোমল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল—আমাদের কি অত সাহস হয় ?

—আপনিও ওই 'টানে' কথা সুরু করেছেন ? তা'হলে কিন্তু পালাবো। আমরা কি বাঘ-ভালুক ? দাদাভাই তো কতদিন আসে, খেয়ে ফেলে বুঝি হালুম করে ?

তাহার ছেলেমানুষি ধরনধারণে উভয়ে না হাসিয়া পারে না।

অমরেশ এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল—খোকা কোথায় বৌদি ?

—পিসীমা নিয়ে বেরিয়েছেন, আসবেন এখুনি।

খোকা আসিলে অমরেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে, শিশু বড় মানুষদের অনেকটা অবলম্বন, চক্ষুলজ্জার আড়াল। একটি শিশুকে কেন্দ্র করিয়া আলাপ আলোচনার পথ সরল হইয়া যায়।

তাছাড়া—দেখাইয়া গর্ব্ব করিবার মত বস্তু যে তাহাদের একটিও আছে তাহা জানাইতে ইচ্ছা হয় বৈকি।

পিসীমার গতিবিধি কোথায় কোথায় তাহা অনেকটা জানা আছে, খোঁজ নিতে দোষ কি ?

—রান্নাঘরে বসলে তোমার কিন্তু ভালো শাড়ীখানা নষ্ট হয়ে যাবে—আরতি অনুযোগ করে।

একখানা ছোট পিঁড়ির উপর চাপিয়া বসিয়া মন্দিরা কহিল—

—ভারী শাড়ী ! কিন্তু আপনার ঠাকুরপো চটে মটে গেলেন কোথা ?

আরতি স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে কহিল—আমার ঠাকুরপো চটবার ছেলে নয়।

দেখা গেল ঠাকুরপো সম্বন্ধে মন্দিরার কৌতূহল কম নয়।

গল্পে গল্পে এতশীঘ্র দুইটি অসমবয়সী মেয়ের মধ্যে কেমন করিয়া একটা নিবিড় সৌহার্দ্দ্য গড়িয়া উঠিল বলা কঠিন। আরতি যেন দীর্ঘদিনের পর খোলা আকাশের মুখ দেখিয়াছে।

ইহার অভিসন্ধিলেশহীন সহজ কথা, প্রাণখোলা মুক্ত হাসি, সরল পরিহাসের ভঙ্গী, সর্বোপরি মধুর প্রগল্‌ভ স্বভাব মুহূর্তে আকৃষ্ট করিয়া তোলে।

এ বাড়ীতে সচরাচর আনাগোনা করেন—কৃষ্ণবালার সখীমণ্ডলী। তাঁহাদের দেখিলে আরতির প্রাণ শুকাইয়া আসে। তাঁহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হওয়াও যতটা নিন্দনীয় ব্যাপার, ততটাই নিন্দনীয় সহজভাবে আলাপ করা।

বৌ মানুষ লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া গিন্নীদের কথায় যোগ দিবে—এটা কৃষ্ণবালার অত্যন্ত না-পছন্দ ব্যাপার। উষারাণী আসে মাঝে মাঝে, তাহাকে দেখিলেও হৃৎকম্প হয়, স্পষ্টবক্তার গৌরবরক্ষা করিতে সে বধূর দিক টানিয়া পিসীমার সহিত বচসা করিয়া যায়—তাহার তাল সামলাইতে হয় আরতিকে।

আর আসে মেনকা।

তাহার হাবভাব দৃষ্টিকটু, কথাবার্ত্তা অমার্জ্জিত, পরিহাসের ভঙ্গী অশ্লীল, মোটের মাথায় সমবয়সী হইলেও মেনকার সখীত্ব বাঞ্ছনীয়ও নয়, প্রীতিকরও নয়।

তাই মন্দিরার মত সরল কিশোরীর সঙ্গ আজ আরতির কাছে যেন কোন বিস্মৃত জগতের হাওয়া বহিয়া আনিয়াছে।

খবর পাইয়া খোকাকে লইয়া পিসীমাও যে আসিয়া হাজির হইতে পারেন এটা অমরেশের খেয়াল ছিল না। পিসীমাকে আসিতে দেখিয়া সে ক্ষুণ্ণচিত্তে চলিয়া গেল বিজয় মল্লিকের রিলিফ কমিটীর মিটিঙের উদ্দেশে।

অনাত্মীয়া বয়স্থা মেয়ের সহিত হাস্য-পরিহাস পিসীমার সন্দিগ্ধ চোখে যে কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে, সে জ্ঞান অমরেশের আছে বটে, কিন্তু মন্দিরার নাই। সে আপন স্বভাব-ধর্ম্মে সহজ হইতে পারিবে কিন্তু অমরেশের পক্ষে হইয়া উঠিবে কঠিন।

অতএব সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাবিবে অভদ্র? ভাবুক, উপায় কি! আচ্ছা রিলিফ কমিটীর প্রস্তাব লইয়া একদিন যাইলে কেমন হয়?

হঠাৎ মন্দিরার চিন্তাটাই বা এত করিয়া মনে আসিতেছে কেন? কত মেয়েই তো আছে পাড়ায়, ছেলেবেলায় কতইতো দেখিয়াছে তাহাকে।

শাড়ী ধরিলে মেয়েরা যেন নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করে।

পিসীমার কোলে খোকাকে দেখিয়াই মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া টানাটানি সুরু করিল।

—ও মা কী সুন্দর, কী চমৎকার মিষ্টি খোকাটা! এসো আমার কাছে।

পিসীমা একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ গা বৌমা, তুমি তো আর খ্রীষ্টানের মেয়ে নও? রান্নাঘরে জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকতে নেই এটুকু শিক্ষে দিতে পারনি?

মন্দিরা অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরতি যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। কথাটা যে তাহার মনে উদয় হয় নাই এমন নয়,

কিন্তু এই সুদর্শনা সুসজ্জিতা তরুণীটির সম্মুখে ও-কথা উচ্চারণ করিতে তাহার বাধিয়াছে, কিন্তু পিসীমার যে ঘরে পা দিয়াই নজরে পড়িল ইহাই—আশ্চর্য্য!

—তুমি যতীন মুখুজ্যের মেয়ের দৌহিত্রী না?

মন্দিরা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—গঙ্গাচান করতে যেতে রোজ গাড়ী চড়ে ইস্কুলে যাও দেখি কিনা। বে-থা হয়নি বুঝি এখনো?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আছে কি না বুঝিতে না পারিয়া মন্দিরা নীরব রহিল।

—যতীন মুখুজ্যের এ পক্ষের বৌ তোমায় পুষ্যি নিয়েছে বুঝি?

এই শ্রীহীন প্রশ্নে মন্দিরা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

কৃষ্ণবালা আবার স্বগতঃ মন্তব্য করিলেন—সেই যে কথায় বলে না, "কান কাঁদে সোনা বিনে, সোনা কাঁদে কান বিনে—", ঘরে পয়সার অবধি নেই যতীন মুখুজ্যের, এ পক্ষে দু'দশটা ছেলেপুলে হলে তারা তো খেয়ে পরে বাঁচতো? তা না আকালের ঘরে শূয়োরের পাল। তবে অতীন মুখুজ্যের গুচ্ছির আণ্ডাবাচ্চা হয়েছে, না?

মন্দিরা বিস্মিত দুই চক্ষু মেলিয়া পিসীমার বাক্যনিরত রসনার পানে চাহিয়া রহিল।

—দুই ভায়ে এক অন্ন? না ভেন্ন হাঁড়ি?

পিসীমাকে যতই ভয় করুক, তবু এই অভদ্র প্রশ্নের বিরুদ্ধে আরতির সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

—ও ছেলেমানুষ অত কথা জানে না পিসীমা।

—কি জানি মা একটা কথারও তো উত্তর পেলাম না, অথচ এতক্ষণ তো মুখে খই ফোটাচ্ছিলে দু'জনে, আমায় দেখে বাক্যি হ'রে গেল একেবারে।...যাই অবেলায় আবার চান করে মরি, জুতো পরে ছোঁয়া গেল।—বলিয়া দুইটি বাক্যহীনা তরুণীকে প্রস্তরে পরিণত করিয়া খোকাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন পিসীমা। খোকার—"মা'ল কাথে দাবো, মা'ল কাথে দাবো,—" শব্দের করুণ আবেদন গ্রাহ্যও করিলেন না তিনি।

বিজয় মল্লিক তীব্র ভৎর্সনা করিতেছে অমরেশকে। মিটিং বন্ধ হইয়া আছে, মেম্বাররা কেহই আসে নাই—বিজয় মল্লিক একা আর কতদিক সামলাইবে?

চাঁদা যাহা উঠিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে লজ্জা করে। উচিত হইতেছে পাড়ার ছেলেদের জড় করিয়া চাল, ডাল, পুরানো কাপড় সংগ্রহ করিতে বাহির হওয়া। আবশ্যক খানিকটা লাল সালু, দু'খানা বাখারি আর ভাঙাচোরা একটা হারমোনিয়াম।

গান বাঁধিয়া দিবে বিজয় মল্লিক নিজে।

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল - ক্ষেপে গেছিস, গান গেয়ে ভিক্ষে করতে বেরোলে গায়ে ধূলো দেবে লোকে। ও-সব কি ভদ্রলোকের কাজ?

—তবে ভদ্রলোকের কাজটা কি শুনি? শাড়ীর আঁচল দেখলেই মূর্চ্ছা যাওয়া?

এইমাত্র বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া অসতর্ক অবস্থায় মন্দিরার নামোল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছে অমরেশ। ভাবিয়াছিল মনগড়া একটা কারণ দর্শাইয়া দিবে, কিন্তু মিথ্যাকথা কেমন জিবে আটকায়।

বিজয় মল্লিক ঝাঁজালো গলায় কহিল—যদি বুদ্ধিমান্ হ'স্ তো মেয়েটার সঙ্গে ভাব করে ফেলে ফুস্‌লে-ফাস্‌লে মোটা কিছু আদায় করে নে। বড়লোকের ধিঙ্গি মেয়ে, চাই কি একখানা গয়নাই খুলে দিতে পারে গা থেকে।

—মতলব নিয়ে ভাব-টাব করতে পারবো না আমি।

—তা' পারবে কেন? ভাবুক চূড়ামণি, প্রেমে পড়গে যাও। কাল যেতে হবে প্রবীরের বাড়ী, বুড়োতো টাকার কুমীর, কিছু খসানো দরকার।

—যেতে হয় তুই একলা যা।

—কেন তোর কি হ'ল শুনি?

অমরেশ একটু চালাকী করিয়া বিজয় মল্লিকের সেন্টিমেন্টে আঘাত করে—কেন, বড়লোকের খোসামোদ করতে যাবো কেন? আমরা গরীব, গরীবের মত করেই আমাদের নিরন্ন ভাইবোনেদের সাহায্য করবো। করবো আমাদের প্রাণ দিয়ে, মুখের অন্ন দিয়ে পরিধেয় বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়ে দিয়ে—ধনীর দরজায় ভিক্ষা নিয়ে নয়।

বিজয় সহসা চমকাইয়া ওঠে, নূতন আলোক চোখে পড়িয়াছে তাহার। অমরেশের পিঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়া বলে—ঠিক বলেছিস অমরেশ, সত্যিই বটে, এ্যাঁ? আমরা আমাদের মুখের অন্ন দিয়ে, পরনের আধখানা দিয়ে গরীবকে বাঁচিয়ে তুলবো—কি বলিস?

—তাই তো বলছি, কিন্তু সাবধান চট্ করে ছিঁড়ে ফেলিস নি যেন ধুতিখানা। বারো টাকা জোড়া—মনে রাখিস সেটা।

—দূর, অত হিসেব করে কিছু হয় না।

পূর্ব্বের আইডিয়া বাতিল করিয়া নূতন আইডিয়া করিতে থাকে বিজয় মল্লিক।

—কিন্তু তুই বোধ হয় ইচ্ছে করলেই লেকচার দিতে পারিস অমরেশ?

—সকলেই পারে।

—পাগল! ভাব থাকলেও আমার তো ভাষাই যোগায় না মুখে। কিন্তু তোর—মনে হচ্ছে ভাব-ভাষা দুইই আছে। কবিতা টবিতা লিখিস না তো? মানে ওই এখনকার কটমটে ভাষায়? "লাল আকাশ", "লৌহ দানব", "মরা শকুন", আর "ভাগাড়ের গরু" নিয়ে?

- মাথা খারাপ!—বলিয়া সমস্ত আলোচনার উপর যবনিকা টানিয়া দেয় অমরেশ।

বিজয় কল্পনা করিতে থাকে···অমরেশ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বাক্যের ঝড় তুলিয়াছে—হাজার হাজার শ্রোতা বক্তার যুক্তির সারবত্তায় মুগ্ধ হইয়া পকেট উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে বিজয় মল্লিকের বৃহৎ বাক্সটির কম্পিত গহ্বরে।···মেয়েরা দিতেছে গলার হার, হাতের চুড়ি, ব্রোচ্, কানপাশা খুলিয়া। দুর্গতের ঘরে ঘরে দুই হাতে দান করিতেছে বিজয় মল্লিক অন্নবস্ত্র, ঔষধপত্র।

হায়, এই স্বপ্ন কি সফল হইবার নহে!

এতই অসম্ভব!

অমরেশ কি বক্তৃতা দিতে রাজী হইবে?

যাহার যতো সামর্থ্য, ব্যয় করিতে সে ততো কুণ্ঠিত হয় কেন?

প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের সামান্যতম অংশটুকুও দান করিতে বিমুখ হয় মানুষ কোন্ লজ্জায়?

প্রবীর হীরার আংটি পরিয়া বেড়ায় কিসের সুখে?

বিজয় মল্লিকের দৃষ্টি দিয়া সকলে দেখিতে চায় না কেন?

মানুষের উপর মানুষের সহানুভূতির অভাব তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে থাকে।

আর অমরেশ ভাবিতে থাকে অন্য কথা।...বোমা যদি পড়েই, এ পাড়ায় পড়িলে দোষ কি?...'বড় বাড়ী' 'ছোট বাড়ী'র বিবাদ ঘুচিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় সকলকে। ক্ষীণ সুকুমার প্রাণগুলি রক্ষা করিতে বলিষ্ঠের সবল বাহু অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়।... কত অসম্ভাব্য ঘটনা ঘটিতে পারে। বিপদের মুখে হৃদয়ের আদান-প্রদান সহজ হইয়া আসে।

সহসা খোকার মুখ মনে করিয়া শিহরিয়া ওঠে অমরেশ।

মেনকার চিঠির উত্তর আসে না।

কিন্তু উত্তর আসিবার আশা কি সত্যই আছে?

তবুও মেনকা প্রত্যহ রঙিন কাগজে 'প্রাণাধীকেষু' সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখিবেই। মেনকার মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—মরণ আর কি, তোর যেমন গলায় দেবার দড়ি জোটে না মেনি; তাই সেই চামারকে খোশামোদ করে মরিস। পেটে যদি ঠাঁই দিতে পেরে থাকি, হাঁড়িতেও ঠাঁই দিতে পারবো।

যেন পেটের ভাত জুটিলেই সকল প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে মেনকার।

মেনকার মা আরও বলে—তোর ভাত-কাপড়ের যোগান দিতে পারবো মেনি, চিঠি লেখার খরচ যোগাতে পারবো না।

মেনকা তাই পাড়ার ছেলেদের ধরিয়া চিঠির ঠিকানা লেখায়, আর পোষ্টেজের খরচ দিতে ভুলিয়া গিয়া বলে—চিঠিটা অমনি ডাক বাক্সোয় ফেলে দিয়ো না ভাই।...আজও তাই জানলা হইতে অমরেশকে দেখিতে পাইয়া ডাক দেয়—ও অমরেশদা!

অমরেশ জানে মেনকার ডাকিবার কারণ কি। মেনকার এই ব্যর্থ চেষ্টায় দুঃখ হইলেও হাসি আসে অমরেশের। বলে—কি রে মেনি?

—বলছি এই চিঠিখানায় আপিসের ঠিকানা লিখে দেবে অমরেশ দা? ফিকে গোলাপী রঙের খামখানা হাতে লইয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায় মেনকা।

লিখিয়া দিয়া অমরেশ প্রশ্ন করে—চিঠি দিলে উত্তর পাস না তো দিস কেন?

হঠাৎ মেনকা অমরেশের নিতান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া ছলছল চোখে অকারণ মৃদুস্বরে বলে—প্রাণের ভেতর যে বড্ড হু-হু করে অমরেশ দা!

অমরেশ এই গায়েপড়া ভাবটায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছে মেনকে, লজ্জা করিবার কিছুই নাই, আপনার বোনের মতই মনে করা চলে।

কিন্তু মেনকার ধরনধারণ কেমন বিশ্রী। কাছে আসিলেই, সাদা কথাও কয় ফিস্‌ফিস্ করিয়া, নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত, চুলে-মাখা সস্তা কেশতৈলের উগ্র গন্ধটা নাকে আসিয়া গা ঘিনঘিন করে।

—কালো গৌরাঙ্গ গেল কোথায়?—বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করে অমরেশ।

—ছোড়দা গেছে কয়লার চেষ্টায়—আবার তো দু'টাকা করে মণ হ'ল।

—তাই নাকি? আমাদেরও তো তা'হলে দেখতে হয়—বলিয়া যেন এইমাত্র কয়লাই দেখিতে যাইতেছে অমরেশ, এইভাবে মেনকাদের রোয়াক হইতে নামিয়া পড়ে।

মেনকা তাড়াতাড়ি বলে—চিঠিটা অমনি নিয়ে যাও না ভাই—ডাকে দিয়ে দিও।

উল্টাইয়া দেখিবার আবশ্যক করে না। অমরেশ ঠিক জানে, স্ট্যাম্প মারা নাই।

অমরেশ চলিয়া গেলে মেনকা ঘরে আসিয়া আরসির সামনে দাঁড়ায়। মাড়ি বার করা বড় বড় উঁচু দাঁতের পাটির উপর হাতটা চাপা দিয়া মুখের উপরের অংশটা ঘুরাইয়া দেখে।

কপালের টিপ্‌টা সাবধানে বাদ দিয়া আঁচলে মুখটা মুছিয়া লয়। জ্যালজেলে খোলের রঙিন ডুরেখানা আবার একবার গুছাইয়া পরে, বহুক্ষণ ধরিয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

সাজিতে এত ভালো লাগে কেন মেনকার? কেন ভালো লাগে ঠসক-ঠমক করিয়া বারবার আরসির সামনে তার যৌবনকে দেখিতে?

স্বামী নেয় না, তবু বিকাল হইলেই পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে ইচ্ছা হয় কেন? রঙিন শাড়ীখানি পরিতে না পাইলে মন ওঠে না কেন? পায়ে আলতা দিয়া কপালে টিপ আর মুখে পাউডার লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগে কেন?

বাছিয়া বাছিয়া এই সময়টাই চিঠির ঠিকানা লিখিয়া দিবার জন্য একে-ওকে ডাকিতে ইচ্ছা হয় কেন? নিজের আচরণের অসামঞ্জস্য নিজের চোখে ধরা পড়ে না মেনকার।

বিবাহের পর মাত্র বৎসর খানেক শ্বশুরঘর করিয়াছিল মেনকা, কিন্তু তাহার পর আজ দেড় বৎসর বাপের বাড়ী পড়িয়া আছে, আর উদ্দেশ করে না তাহারা। মেনকার মা জামাই বাড়ীর প্রত্যেকের নামে কুৎসা রটাইয়া বেড়ায়, আর উদ্দেশে শাপ শাপান্ত করে।

॥ চার ॥

প্রবীরের লেখার টেবিলের উপর জাঁকিয়া বসিয়া মন্দিরা নিজের বিজয় অভিযানের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়া, দুই হাত জোড় করিয়া বলে—দোহাই দাদাভাই আর যাচ্ছিনা। বৌদিকে খুব ভালো লাগলো সত্যি, কিন্তু শ্রীমতী পিসীমা? তাঁর শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম সে এক অদ্ভুত চিজ্!

—আহা বেচারা বৌদি সারাদিন ওই দুর্দান্ত শাসনের তলায় থাকে!—প্রবীর বলে।

—তা সত্যি—মমতাপূর্ণ কণ্ঠে মন্দিরা সায় দেয়—প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল বেচারা।

—পরের ওপর কোন হাত নেই, দেখেছিস মন্দিরা? একজন আর একজনের উপর শত অত্যাচার করছে দেখেও প্রতিকারের উপায় থাকে না।

—চারটি বই পাঠিয়ে দিলে কিন্তু বেশ হয় দাদাভাই! বলছিলেন বই পড়তে পেলে আমি পৃথিবীর কোন দুঃখই গায়ে মাখি না। খুব বই পড়তে ভালবাসেন। ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিল, বাপের কাছে একলা কাণপুরে মানুষ হয়েছেন—শুধু বই আর গান নিয়েই থাকতেন।

—গান?

—হ্যাঁ ভাই, মনে হ'ল গান-বাজনা ভালই জানতেন, এখন অবশ্য একেবারেই ভুলে গেছেন বলছিলেন, সেতারের ওয়াড়ের ওপর দু'ইঞ্চি ধূলো জমেছে। আচ্ছা দাদাভাই, মানুষ কেন মানুষকে এত দুঃখ দেয় বলতো?

—সারা জগৎ তো ওই 'কেন'র উত্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছে মন্দিরা।

রাধা ঝি আসিয়া হাঁক দেয়—দিদিমণি, মা বললেন আজকে আপনাকে খাবার তৈরি শেখাবেন, ওপরে চলে আসুন।

—কি খাবার?

রাধা দুই হাত উল্টাইয়া বলে—আমি কেমন করে জানবো গো? মা তো সেই এষ্টোভ জেলে নানানিধি নিয়ে বসেছেন। আমায় বললেন—রাধা, দিদিমণিকে ডেকে দে, আজ কলেজের ছুটি আছে, আমার কাছে বসে খাবার তৈর শিখুক।

চঞ্চলা মন্দিরা লাফাইয়া উঠিয়া বলে—দাদাভাই নেমন্তন্ন রইল।

—কি তুই অখাদ্য করে রাখবি, খেতে না পারলে?

—তাই বই কি? সেদিন মাংস রেঁধে খাওয়াই নি? বড় যে প্রশংসা করা হয়েছিল?

—সেদিন? ওঃ চামচটা একবার ডুবিয়েছিলি বটে—নইলে ঠাকুরই তো—

—ইস্, ঠাকুর তো শুধু নুন আর আদা-টাদা গোছের হিজিবিজি কতকগুলোর মাপ দেখিয়ে দিয়েছিল আর ডেকচিটা নামিয়েছিল—গরম ডেকচি নামাতে পারি আমি?

—ডেকচিটা ঠাকুর নামিয়ে দিয়েছিল আর চাপিয়ে দিয়েছিল, কেমন?

—হুঁ।

—বাকীটা সবই তুই রান্না করেছিলি? বাঃ বাঃ বেশ বেশ, খাবারটাও ওই ভাবে সমস্ত তৈরি করে রাখিস, কেমন?

—তুমি আমায় ঠাট্টা করছো—হ্যাঁ?

—ঠাট্টা? বলিস্ কি রে?—দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রবীর বলে—তোর সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক? করলেই হ'ল! পাগল আর কি!

মন্দিরা একটা কীল দেখাইয়া ছুটিয়া পালায়।

উপরের দালানে জ্যোতির্ময়ী দেবী ক্ষীরমোহন আর কড়াইশুঁটির কচুরীর মশলা লইয়া গুছাইয়া বসিয়াছেন। মন্দিরা পিছন হইতে দুই হাতে গলা জড়াইয়া পিঠের উপর মুখ ঘষিয়া কহিল—মাগো মা-মণি, কি বলছো মা!

জ্যোতির্ময়ী হাসিয়া বলেন—রকম দেখ মেয়ের, বলছি দু'একটা খাবার তৈরি শেখ্না।

—কেন মা তুমি তো সব জানো।

—আমি জানলেই তোর কাজ চলবে? বড় হচ্ছিস্, শিখবি না?

—বা-রে কেবল তুমি আমায় বড় করে দিচ্ছ মা,—বড় হচ্ছিস্ সেলাই শেখ্, বড় হচ্ছিস্ রান্না শেখ্—বড় হয়ে কী চোর দায়ে ধরা পড়েছি বলতো?

—আচ্ছা পাগল মেয়ে, কাজকর্ম্ম না শিখলে তোর দাদামশাই দিদিমা বলবে—মেয়েটিকে আদর দিয়ে ধিঙ্গি করেছে।

ওদের উল্লেখে ভারী দমিয়া যায় মন্দিরা। জ্যোতির্ময়ী যে তাহার সত্যকার মা, ছেলেবেলাকার এ ধারণাটা অবশ্য আর নাই, জ্যোতির্ময়ীর নির্দ্দেশমত তাহার চির অপরিচিত দাদু-দিদা, পিতা মাতাকে চিঠি পত্রও দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটা নিতান্তই বাধ্য হইয়া।

জ্যোতির্ময়ী জানেন পূর্ণশশী এবার মেঘে ঢাকা পড়িল, তাই সস্নেহে বলেন—তোর বাবা যে আসছে শীগগিরি। তা' হাতের রান্না টান্না খাবার-দাবার খাইয়ে দিবি না দু'চারখানা? সার্টিফিকেট আদায় হবে।

—সার্টিফিকেট—আমার কি দরকার? নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করিয়া মন্দিরা বলে—হ্যাঁ মা, সত্যি না কি?

—কি সত্যি?

—ওই যে কার আসবার কথা বললে।

—ওমা, কার কি রে, তোর বাবা-মার আসবার কথা বলছি যে! মাঝে মাঝে তো আসে কলকাতায়, কিন্তু কখনো এখানে উঠতে চায় না। সেই কোথায় পিসীর বাড়ী গিয়ে ওঠে। আর এবারে তো প্রায় ছ'সাত বছর পরেই আসছে, কি ভাগ্যি যে চিঠি দিয়েছে এসে দু'চার দিন থাকবে বলে।

অপরিচিত পিতামাতা সম্বন্ধে লেশমাত্র কৌতূহল ছিল না মন্দিরার, বরং একটা অকারণ বিদ্বেষ ভাবই ছিল, তাই আগমন সংবাদে উল্লসিত না হইয়া মনমরা ভাবে জ্যোতির্ময়ীর নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

জ্যোতির্ময়ী অবশ্য প্রবীরের অপেক্ষা কিছু কম দেখেন না মন্দিরাকে, নিজের কন্যা থাকিলে যে আরো অধিক ভালো বাসিতেন এমন কথা নিজের কাছেও স্বীকার করেন না, তবু 'নিজের নয়' এই বোধটুকু ভিতরে পীড়া দেয় বৈকি।

তাই দৌহিত্রী-জামাতার আসার সংকল্পে ঈষৎ চিন্তিত হইয়াছিলেন জ্যোতির্ময়ী। কলিকাতায় আসিলে অমিয়া অথবা আনন্দময় যে তাঁহার বাড়ী না উঠিয়া দূর সম্পর্কের পিসীর বাড়ী উঠে, এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেও খুব বেশী দুঃখিত হ'ন না। তত্ত্বতাবাসের কাপড় জামা প্রভৃতি পাঠাইয়াই এ পক্ষের কর্ত্তব্যের ভার লাঘব করেন।

লোকে হয়তো বলিতে পারে সতীনের নাতনী নাত-জামাইয়ের উপর কতই আর টান হইবে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জ্যোতির্ময়ীর সে বিদ্বেষবোধ ছিল না। যেমন 'বড়' হইয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তেমনি স্বামীর আত্মীয়-কুটুম্ব প্রিয়-পরিজন সকলের সঙ্গেই বড়র মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। বয়সে বড় অরুণপ্রভা অনেক বেশী দিন আগে আসিয়াও অর্দ্ধেক আত্মীয়-কুটুম্বের নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

শুধু মন্দিরাকে লওয়ার পর হইতেই জ্যোতির্ময়ীর মনে জন্মিয়াছিল ভয়। এই বুঝি চাহিয়া লয়, এই বুঝি কাড়িয়া লয়। বিধিবদ্ধ ভাবে পোষ্য লইতে ইচ্ছা হয়না—তাঁহার প্রবীর বাঁচিয়া থাক্। তাছাড়া ওটা কেমন যেন সেকেলেপনা বলিয়া মনে হয়। তবু আজ আনন্দময় আসার নামে ভিতরে ভিতরে একটা বিষাদের সুর বাজিতেছিল, এখন ভাবিতেছিলেন আইনসঙ্গত ভাবে পোষ্য লইলে হয়তো এমন হারাই-হারাই ভাব হইত না। ভাবিলেন, মন্দিরার শিক্ষায় সভ্যতায় আচারে আচরণে এতটুকু খুঁৎ বাহির করিতে দিবেন না তাহার পিতার কাছে। তাহারা যেন ভাবিতে পারে মেয়েকে বিলাইয়া দিয়া ক্ষতি হয় নাই তাহাদের।

পয়সা থাকিলে যে উগ্র আত্মম্ভরিতা থাকা স্বাভাবিক, সেইটির অভাব ছিল বলিয়াই জ্যোতির্ময়ীর এত উদ্বেগ।

নতমুখে কিছুক্ষণ কাজ করিয়া মন্দিরা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আর ভাল লাগছে না মা!

—সে কিরে, এই 'পাক'টা শেষ পর্য্যন্ত দেখ্। রসটা গাঢ় হয়ে ক্ষীরমোহনগুলো ক্রমে লালচে হয়ে আসবে—

—ছাই ক্ষীরমোহন—বলিয়া মন্দিরা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে প্রবীর তখনো মন্দিরার পরিত্যক্ত সোফাখানায় বসিয়াছিল। মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া তাহারই একাংশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—দাদাভাই চলনা কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—কই আমার নেমন্তন্ন? কি সব রান্না করতে গেলি—

—ছাই নেমন্তন্ন। চল বাইরে কোথাও ঘুরে আসি, ভাল লাগছে না বাড়ীটা।

বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রবীরেরও হইতেছিল, কিন্তু শীতের মধ্যাহ্নের সংকল্পটা কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটাও শিথিল হইয়া গেল।

মন্দিরার তাড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আমারও তো বাড়ী বসে থাকতে ভাল লাগছে না, লম্বা কোথাও বেড়িয়ে আসলে মন্দ হ'ত না, কিন্তু বেলা পড়ে এল যে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে না?

—হোক্‌গে, ভূতে ধরবে না তো। চলো বেলুড় মঠে যাওয়া যাক্।

—বেলুড়ে? এখন?

—কেন নয়? সন্ধ্যারতি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে!

—বলেছিস মন্দ নয়—আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে আয় না যদি যেতে রাজী হন।

—না না, মার এখন কুটুম্ব আসবে, ভীষণ ব্যস্ত। তুমি নিয়ে যাবে কি না তাই বলো?

—চল্ যাওয়াই যাক্।

বলিয়া আলস্য ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়ে প্রবীর।

জ্যোতির্ময়ী বিস্মিত সুরে কহিলেন—সে কিরে মণি, তোর বাবা আসছে, গাড়ী গেছে ষ্টেশনে, আর এখন বেরোবি?

—এসেই আমাকে কি দরকার পড়বে শুনি?—সিল্কের শাড়ীখানা গুছাইয়া পরিতে পরিতে দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলে—তোমার সঙ্গে তো সম্বন্ধ ভালোই, কোরো না গল্প টল্প—বলিয়া ছুটিয়া পলায়।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিবার সময় গলির মুখ হইতে বাহির হইল অমরেশ ও বিজয় মল্লিক। বলা বাহুল্য চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। কাঁচপোকার সহিত তেলাপোকার মত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে—অমরেশকে টানিয়া বেড়ায় বিজয় মল্লিক, কিন্তু কাজ যে খুব বেশী অগ্রসর হইতেছে তাহা নয়। তাছাড়া যাহাদের উপকারের চেষ্টায় বিজয় মল্লিকের আহার নিদ্রা নাই, তাহারা যে উপকারের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া আছে এমন মনে করিবারও হেতু নাই।

তাহারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু মানিয়া লয়। মানাইয়া লয় আপনাদেরকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দুঃখ দুর্দ্দশার সঙ্গে। যে অবিচারের মৃত্যু আসিয়াছে মানুষের হাত হইতে, তাহার জন্য মানুষকে তাহারা দায়ী করে না, করে নিয়তিকে।

মানুষের কাছে তাহারা আশা করে না, করে জুলুম। তাহাদের ভালো করিবার, মঙ্গল করিবার জন্য কাহারও মাথাব্যথা পড়িয়াছে এ বিশ্বাস নাই বলিয়াই ক্ষুধার অন্ন, লজ্জার আবরণ ও মাথার আচ্ছাদনের জন্য লোকের দয়ার উপর জুলুম করিয়া বেড়ায়।

তাই বিজয় মল্লিকের মত আত্মহারা প্রেমিকের কোন মূল্য নাই উহাদের কাছে, বরং অকারণ মাথাব্যথাকে সন্দেহের চোখেই দেখে তারা।

তবু বিজয় মল্লিকের ছুটাছুটির কামাই নাই।

গাড়ীর ভিতর হইতে মন্দিরা ডাকিল—ও অমরেশ দা, কোথায় চলেছেন?

অমরেশ ইতস্ততঃ করে, বিজয় মল্লিক পিছন হইতে ঠেলা মারে—অর্থাৎ চল চল নিজের কাজে চল।

অমরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া মন্দিরা আবার বলে—কোন দরকারি কাজে না কি? না হয় তো আসুন না আমাদের সঙ্গে, বেড়িয়ে আসা যাক্।

দুই জনের মধ্যে বিশেষ করিয়া এক জনকে আহ্বান করার মধ্যে যেটুকু ভদ্রতার অভাব আছে তাহার জন্য বিব্রত বোধ করে প্রবীর, তাড়াতাড়ি বলে—ওকি মন্দিরা, ওর হাতে কাজ র'য়েছে।

—আহা বলছিই তো যদি কাজ না থাকে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অমরেশকে ঠেলিয়া দিয়া বিজয় মল্লিক উপরপড়া হইয়া বলে—হ্যাঁ কাজ আছে বইকি, গরীবের সর্ব্বদাই কাজ। আপনাদের মত গাড়ী চড়ে, হাওয়া খেয়ে বেড়াবার অবস্থা তো সকলের নয়!

অমরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, ঈষৎ বিরক্তভাবে বলে—সব সময় ফাইট্ করিসনে বিজয়, থাম্···তোমরা কোন্ দিকে প্রবীর?

—যেদিকে দু'চক্ষু যায়—প্রবীরের হইয়া উত্তর দেয় মন্দিরা—আচ্ছা থাক, আপনার কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে কথা কইলে—আমরা নিষ্কর্ম্মা মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

মন্দিরা কি সকলের কাছেই মান-অভিমান করিবে নাকি! আচ্ছা এক মেয়ে হইয়াছে, ভারি হাসি পায় প্রবীরের। ঈষৎ হাস্যে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে—ইনি সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করে মঠে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, বুঝলে অমরেশ? আমি শুধু রথের সারথী।

—আঃ দাদাভাই, আবার লাগছ আমার সঙ্গে?

—লেগেই তো আছি—প্রবীর হাসিয়া ওঠে। বরং তুই-ই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিস।

—তার মানে?

—মানে, মান-অভিমানের পালা সুরু হয়েছে আর একজনের সঙ্গে।

দুষ্টহাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কথা কয়টা উচ্চারণ করে প্রবীর।

সহসা মুখরা মন্দিরা লজ্জায় রাঙা হইয়া চুপ করিয়া যায়, কিন্তু একটা উত্তর না দেওয়া যে অধিকতর লজ্জার বিষয় এ জ্ঞানটুকু থাকা সত্ত্বেও চট করিয়া উত্তর দিতে পারে না।

ইহার অবসরে—"তোমরা তা'হলে দরকারী কথাগুলো সেরে নাও অমরেশ—আমার কাজ আছে" বলিয়া বিজয় হন হন করিয়া আগাইয়া যায়।

বিজয়ের রূঢ় মন্তব্যকে অমরেশ ভয় করে—কিন্তু সুন্দরী তরুণীর অভিমানস্ফুরিত দৃষ্টির আহ্বান কি জগতের সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ করিতে শেখায় না? তাছাড়া অভদ্রের মত কথার মাঝখানে চলিয়া যাওয়াই বা কেমন দেখায়?

মন্দিরা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলে—যান আপনার বন্ধু রাগ করে চলে গেলেন—

—রাগ কিসের? পাগল না কি, ও অমনি ব্যস্তবাগীশ, জগতের লোকের অশান্তির চিন্তায় নিজের শান্তি হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—ও উনিই বুঝি সেই রিলিফ কমিটীর!

—হ্যাঁ তারই একটা কাজে যাচ্ছিলাম একটু।

—তাই নাকি?—অনুতপ্তভাবে মন্দিরা বলে—তা'হলে তোমথার্থই কাজের ক্ষতি করলাম, যান যান।…কিন্তু কই আমাকে তো আপনাদের মেম্বার করে নিলেন না? চলুন কোথায় আপনাদের কি হচ্ছে দেখে আসি।

প্রবীর ষ্টিয়ারিং হুইলে আঙুলের টোকায় তাল দিয়া গুনগুন করিয়া গান গাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মৃদু হাসিতেছিল। মন্দিরা পিছন হইতে তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া কহিল—দাদাভাই, শুনছো আজ আর বেলুড় মঠ হ'ল না বোধ হয়।

—জানতাম হবে না!

—জানতে? কি করে শুনি?

—ঈশ্বর আমার বাড়তি দুটো চোখ দিয়ে ফেলেছিলেন কি না—ভবিষ্যৎটা পরিষ্কার দেখতে পাই।

—পাও তো বেশ করো। চলোনা দাদাভাই, আমরাও অমবেশ দা'দের…কি নাম আপনাদের সমিতির?

—নাম? 'আর্ত্তত্রাণ সমিতি' গোছের কি একটা লম্বা চওড়া আছে যেন।

—ঠাট্টা করবার কি আছে? চল দাদাভাই, আমরাও দলে নাম লেখাই গে, তবু কাজ করবার সুযোগ পাবো। সত্যি, শুধু বেড়ানো আর ঘুমানো ছাড়া কি বা করছি আমরা?

—যার যেটুকু ক্ষমতা তার বেশী সে কি করবে? —প্রবীর অভিমত ব্যক্ত করে।

—বলতে চাও কিছু কাজ করবার ক্ষমতা নেই আমাদের?

—আমার তো তাই ধারণা।

—তোমার ধারণা নিয়ে তুমি থাকো।…অমরেশদা, আমি আপনাদের দলে।—বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে মন্দিরা।

—যাক এতদিনে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচলো আশা হচ্ছে।—বলিয়া প্রবীর গাড়ীখানা গ্যারেজে তুলিতে যায়।

'আর্ত্তত্রাণ সমিতি'র কার্য্যালয় বলিতে বিজয় মল্লিকের একতলার ঘরখানা, আর ছারপোকা বহুল একখানা বড় চৌকি। সে ঘর অবশ্য প্রবীর চেনে, যাইতে গাড়ীর প্রয়োজন হয় না। মন্দিরাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলে ফল ফলিবে উল্টা জানা কথা—কারণ তাহার জেদি স্বভাবের পরিচয় প্রবীরের চাইতে বেশী কে জানে? অতএব সে ভাবিল—মাস্তানাটা দেখাইয়া আনি, সখ মিটুক।

বিজয় মল্লিক রাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল, সহসা উহাদের এই অভূতপূর্ব্ব আবির্ভাবে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু মন্দিরার সদা-সপ্রতিভ রসনা কাহাকেও চুপ থাকিতে দেয় না।

—খুব রাগ করে চলে এলেন তো? আমি কিন্তু আপনার—'আর্ত্তত্রাণ সমিতি'র একজন সভ্য হতে এলাম। আজ থেকে আমাকেও আপনাদের কাজের অংশ বহন করতে দেবেন।

—যথা, ভয়ার্ত্তকে ভরসা দান, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, কি বলিস? শেষেরটা থেকেই বুঝি সুরু?

প্রবীরের টিপ্পনীতে জ্বলিয়া উঠিয়া মন্দিরা কহিল—দেখ দাদাভাই, সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেবার কোন মানে হয় না। তোমার যদি নষ্ট করবার মত সময় হাতে না থাকে, তুমি বাড়ী চলে যেতে পারো, এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

—অর্থাৎ নষ্ট করবার মত সময় তোমার অজস্র আছে?

—হ্যাঁ আছে, একশোবার আছে।…কই অমরেশ দা, আপনাদের খাতাপত্র বার করুন। পরে দেখবেন মেয়েদের আপনারা যত বাজে ভাবেন, ততো বাজে তারা নয়।

—আমি কখনো বাজে মনে করি না।—অমরেশ উত্তর করে।

—কিন্তু আমি করি, মেয়েদের দ্বারা কিছু হয় এ বিশ্বাস আমার নেই।

বিজয় মল্লিকের এই রূঢ় মন্তব্যে যুগপৎ সকলেই বিস্মিত হইল, শুধু প্রবীর স্বাভাবিক পরিহাস প্রিয়তার গুণে কথার রূঢ়তা উড়াইয়া দিয়া কহিল—যাক্ আমার দলে তা'হলে একজনও আছে? ঠিক আমারও তাই মত।

মন্দিরা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—কেন মেয়েরা কিছু বড় কাজ করতে পারেনি, না করেনি?

প্রবীর গম্ভীরস্বরে মাথা নাড়িয়া কহিল—কেউ পারেনি এটা বলতে চাইনে—কিন্তু পার্সেন্টেজ কষলে তার সংখ্যা এতই নগণ্য যে সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

—সেটা মেয়েদের সুযোগের অভাব।

মন্দিরাকে উত্তেজিত হইতে দেখিলেই যে প্রবীরের হাসি চাপা দায় হইয়া ওঠে, এও এক বিপদ। তবু কষ্টে সে হাসি চাপিয়া বলে—ওরে একটা প্রবাদ আছে জানিস—প্রতিভা কখনো সুযোগের মুখ চেয়ে বসে থাকে না।

—প্রবাদের কথা ছেড়ে দাও—সুযোগের দাম আছে বইকি! রবি বাবু যদি ঠাকুর বাড়ীর মত ঘরে না জন্মাতেন—

প্রবীর বাধা দিয়া বলে—থাক্ ও তুলনা ঢের শুনেছি, কিন্তু আর একটা জিনিস ভেবে দেখেছ কখনো যে, ঠাকুর বাড়ীতেও মেয়েদের অভাব ছিল না? কম্‌প্যারেটিভ্‌লি তাঁরা হয়তো তোমার-আমার ঘরের মেয়েদের চাইতেও অনেকটা এগিয়ে গেছেন—তবু নক্ষত্র নক্ষত্রই, সূর্য্য নয়।

মন্দিরা চট্‌পট্ একটা লাগসই উত্তর না পাইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাবে বলে—আচ্ছা সেকালেও তো অনেক মেয়ে—

—যথা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, এই তো? ও সব শুনতে শুনতে কান ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, তবু বিচার বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারি, অভাব আছে বলেই মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিতে দু'হাজার বছর আগের নজীর হাতড়াতে হয়। মেয়েদের হাত পা-গুলো না হয় পুরুষরা বেঁধে রেখে দিয়েছে, কিন্তু মগজটা তো আর কেউ আয়রণ চেষ্টে তুলে রাখেনি? মেয়েদের মধ্যে একটা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির আবির্ভাব ঘটেছে কোনোদিন?

মন্দিরা আর কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অমরেশ হাসিয়া কহিল—তোরা সারাদিন এক বাড়ীতে বাস করিস প্রবীর ?

মন্দিরা দীপ্ত দুইটি চোখ অমরেশের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিল—সারাদিন ঝগড়া করি এই বলছেন তো ?

—বলিনি কিছু, শুধু অনুমান করছি।

—ঝগড়া না হলে বুঝতে হবে—সেদিন শ্রীমতীর স্বাস্থ্য ভাল নেই, বুঝলে অমরেশ।—প্রবীর হাসিতে হাসিতে বলিল।

—সর্ব্বনাশ !—মন্দিরার কান বাঁচাইয়া অমরেশ মৃদুস্বরে কহিল—অভ্যাসটি তো সাংঘাতিক খারাপ করে রাখছ হে, ভবিষ্যতে যিনি ভুগবেন, তাঁর অবস্থাটা ভেবে দেখেছ ?

—ভেবে আর কি করবো, যার যা ভাগ্য ! কিন্তু কই তোমাদের সমিতির খাতাপত্তর কিছু আছে, না কি তাও নেই ?

বিজয় মল্লিক গম্ভীর ভাবে বলে—কাগজে কলমে কাজ আমরা করি না, যা করি হাতে-কলমেই করি। চাঁদার খাতা অবশ্য আছে একটা, কিন্তু বড়লোকের দয়ার দান আমরা নিতে ইচ্ছুক নই।

কথা বলে বিজয়, কিন্তু বিব্রত হইয়া উঠে অমরেশ। কথা চাপা দিবার জন্য বলে—কিন্তু শুধু তোমার-আমার দয়ার দানে তো গরীবের পেট ভরবে না বিজয়, তাছাড়া ইনি তোমার সমিতির মেম্বার হতে চান, ভেবে দেখ এতে সুবিধেও কত। ধর গরীবের ঘরে ঘরে ঢুকে, তাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে, তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস সংগ্রহ করে আনা মেয়েদের দ্বারা যত সহজে হতে পারবে, তেমনি আমাদের দিয়ে হবে কি ?

মন্দিরা অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—থাক অমরেশ দা, আপনাকে আর আমার হয়ে সুপারিশ করতে হবে না। উনি সমিতির কর্ত্তা, ওঁর যখন ধারণা বাজে লোক ঢুকিয়ে কাজ হবে না, তখন আর বলবার কি আছে ! আমরা অকর্ম্মা, আমরা রাবিশ, আমরা ঢেঁকি, সেই ভাল।

এবার বিজয়ও হাসিয়া উঠে। অপ্রতিভ ভাবে বলে—এই দেখুন আপনি রেগে যাচ্ছেন ! মানে আমি বলতে চাচ্ছি—অর্থাৎ আমার বক্তব্য—আমরা যতটা কষ্টসহিষ্ণু আপনারা ততটা—

—নাই বা হ'ল, কিন্তু কাজেরও তো ডিভিশান আছে ? তাছাড়া 'আহা উহু' 'বেচারা অবলা' শুনে শুনেই আমাদের হাত-পা বুদ্ধিবৃত্তি সব পঙ্গু হয়ে গেছে জানেন ?

ইতিমধ্যে আরো জনকয়েকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ এ সময়টা সমিতির ঘরে তালা দেওয়া থাকে, অসময়ে আলো ও মনুষ্য কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া উঁকি দিতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে গুটি গুটি।

সমরও আসিয়াছিল, তবে সাধারণতঃ সে বসিতে চাহে না, দাঁড়াইয়া কথা কহিতেই ভালবাসে, তাই দরজার বাহিরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। মন্দিরার কথাটা শেষ

হইতেই ভিতরে ঢুকিয়া কহিল—আশা করি আপনার কথার উত্তরে দু'একটা কথা বললে আপত্তি করবেন না।

—না।

মন্দিরা একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকে।

—বললেন তো বড় বড় কথা, কিন্তু আজকের দিনে শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ সুবিধে কোনোটাই তো পুরুষের চেয়ে কম পাচ্ছে না মেয়েরা, তার প্রতিদান কই? লম্বা লম্বা ডিগ্রিই নিচ্ছে অথচ দিচ্ছে কি দেশকে? দু'জন মেয়ে একত্র হলেই কি আলোচনা করবে জানেন? লেস আর ফিতে, জরি আর জর্জেট—তা সে রান্নাঘরেই হোক, আর ড্রইংরুমেই হোক। ডক্টরেট পেয়েছেন এমন এক ভদ্রমহিলা লেকচার দিচ্ছেন—ভারতের ঐতিহ্য আর কৃষ্টির ইতিহাসের, তাঁর পরিধানে অর্গ্যাণ্ডি শাড়ী আর নেটের ব্লাউজ, হাতে ঢুকিয়েছেন ডজন দুই কাঁচের চুড়ি আর মুখের সজ্জায় কাজল এবং লিপষ্টিকের শ্রাদ্ধ! কি বলেন একে? —একটা মেয়েকে যদি সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনেন, সে শিখে আসবে কি—না কোন দেশের মেয়েরা কি ভাবে নিজেদেরকে পুরুষের চোখে অধিকতর এট্রাক্টিভ করে তুলছে তারই কৌশল। অস্বীকার করুন, বলুন সত্যি নয়?

অমরেশ বিরক্ত ভাবে বলে—কি বাজে বকছিস সমর, স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা জিনিস আছে, সে জ্ঞানটা হারিয়েছিস?

মন্দিরা আরক্ত মুখে বলে—বলেছেন হয়তো ঠিকই, কিন্তু এটা হচ্ছে অনেক যুগের অলসতার ফল। একদিন হয়ত পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে বাস্তবের রূঢ় ক্ষেত্রে খাটতে খাটতে তার নিজের চোখের কাজল আর পুরুষের চোখের মোহ দুইই মুছে যাবে।

প্রবীর ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ধীরে ধীরে বলে—ঈশ্বর করুন সে একদিনটা আমার জীবদ্দশায় না আসে। উঃ কী ভয়াবহ সেই দিন!…কিন্তু তুমি এক কাজ কর সমর, লড়াইয়ে যাও, সেটাই তোমার উপযুক্ত বিচরণক্ষেত্র। এতখানি স্পিরিট নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়।

—লড়াইয়ে যেতাম, যদি এই হতভাগা দেশটাকে উচ্ছেদ করবার সুযোগ পেতাম। এই বিজয়ের 'আর্ত্তত্রাণ'! শুনলে হাসি পায়! সারা দেশটা মরে পচে গন্ধ বেরুচ্ছে—এক মুঠো খুদ নিয়ে ত্রাণ করতে এসেছিস কা'কে? দুটো দুটো ভাত খাইয়ে কোন রকমে দেহ পিঞ্জরের প্রাণপাখীটাকে আটকে রেখে লাভটা কি? একে কি বাঁচা বলে? ফুটপাতে পড়ে মরছে?—মরুক না! যাদের মরবার সময়ে ফুটপাত ছাড়া আর কিছু জোটেনি, তাদের মরাই উচিত। তোমার বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে একটু ঠাঁই দিয়ে, আর তোমার নর্দ্দমায় ফেলে দেওয়া একটু ফ্যান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কেন তুমি? কি রাইট আছে তোমার খোদার ওপর খোদকারী করার? দুটো আতস বাজীর আগুনে ক'টা হতভাগার লীলাখেলা শেষ হয়েছে, তা'তেই একেবারে বিগলিত দরদে গদ গদ হয়ে উঠেছ? লজ্জা করে না? সমস্ত দেশটা যেদিন দাউ দাউ করে জ্বলবে, সেই দিনই আমার শান্তি হবে, তার আগে নয়!

সমরের কথার ছটায় মন্দিরা নীরব হইয়া গিয়াছিল, প্রবীর কণ্ঠস্বরে চিন্তার সুর আনিয়া কহিল—সমর, তুমি মাথায় মাখতে কি তেল ব্যবহার কর?

—কেন? যা পাই। হঠাৎ?

—মানে—আমি বলছিলাম কাঁচা তিলের তেলটা ভালো জিনিস, নিয়মিত ব্যবহার করে দেখতে পারো। অর্থাৎ দেশের সেই চরম সুখের দিনটা আসা পর্য্যন্ত মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো? ওটাই আবার কোন দিন না দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তাই ভাবছি।

—তোমার মত নাড়ুগোপালের উপযুক্ত কথাই হয়েছে—বলিয়া কপাটটা সশব্দে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া পথে নামিয়া পড়ে সমর।

পরিহাস এবং উপহাসের মধ্যকার সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি সকলের থাকে না। সমর ইহাদেরই দলে।

অবশ্য বিনা প্রতিবাদে দাদাভাইয়ের এমন অপমান সহিয়া যাওয়া মন্দিরার পক্ষে কষ্টকর। সমরের অভাবে সমরের বন্ধুবর্গকেই সে দেখিয়া লয়।

ক্রমশঃ তর্ক পূর্ব্ব খাতে ফিরিয়া আসে, মন্দিরার সারালো এবং ধারালো যুক্তির মুখে বিজয় মল্লিকের পূর্ব্ব কথা ভাসিয়া যায়, ভাবুক বিজয় আবার নূতন আলোক দেখে, নারীই পুরুষের কর্ম্মের প্রেরণা, শক্তির উৎস, শ্রান্তির ঔষধ, এই সহজ কথাটা এতদিন উপলব্ধি করে নাই কেন এই ভাবিয়া আপশোষ আর উৎসাহে হাঁফাইয়া উঠে একেবারে।

তর্কে তর্কে যথেষ্ট রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, প্রবীর এইবার উঠিয়া পড়িয়া বলে—আচ্ছা আজ তা'হলে ওঠা যাক, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কাছে পিঠে দু'চারটা বোমা পড়ে রাতারাতি, তা'হলে মেয়েদের 'অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি আর কোমল হৃদয়বৃত্তির' আসল নমুনাটা চট করে দেখে ফেলা যায়।

বলা বাহুল্য মন্দিরারই ভাষার নমুনা এটা।

অমরেশও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িতেছিল, বিজয় তাহাকে টানিয়া বসাইল, আরো অনেক কিছু আলোচনা করিবার আছে তাহার। অগত্যা বাধ্য হইয়া অমরেশকে বসিয়া পড়িতেই হয়।

মন্দিরা দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—বিজয় বাবু চললাম, কিছু মনে করবেন না।...অমরেশ দা, বৌদিকে আমার প্রণাম দেবেন—আর আপনি নেবেন নমস্কার।

তাহারা দু'জনে পথে নামিতেই পিছন হইতে বিজয় একটা টর্চ্চ ধরিয়া আলো দেখাইল। রাত্রি সত্যই বেশী হইয়া গিয়াছিল।

পথে বাহির হইয়া প্রবীর বলিল—কি গো মহাশয়া, ভক্তি যে একেবারে উথলে উঠলো দেখছি?

—অভক্তি হবারও কোনো কারণ নেই। ছোট থেকেই বড় হয় জিনিস, হঠাৎ একটা বড় কিছু গজিয়ে ওঠে না।

—ওঠে বৈ কি।

—কি?

—হাতীর ডিম এবং তোমার মগজ।

ইহার পর মন্দিরাকে কথা বলানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, এবং যদি বা এতক্ষণ সংকল্প শিথিল ছিল, এখন মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসে, সমিতির উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সে করিবেই।

বলা বাহুল্য, বাড়ীর কথা—পিতার আসিবার কথা, কিছুই মনে ছিল না তাহার।

কিন্তু বাড়ীতে তখন বিপরীত আবহাওয়া বহিতেছিল।

আনন্দময়ী আসিয়াছেন, যতীন মুখুজ্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে আসিয়াছেন। উপস্থিত আপ্যায়ন, সময়োচিত ভোজন, কুশল প্রশ্নের বিনিময় ইত্যাদি যথারীতি শেষ হইয়াছে—ভদ্রলোক এখন কন্যাকে দেখিবার আশায় উৎসুক, আগ্রহান্বিত, ব্যস্ত, ইত্যাদির অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তির পর্য্যায়ে আসিয়াছেন।

কিন্তু কন্যার দেখা নাই।

না প্রবীর, না মন্দিরা। কাহারও চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত না দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীও স্থির নাই। বেড়াইতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছে অথচ গাড়ী পড়িয়া আছে নাকি গ্যারেজে। কি প্রয়োজনে গেল, কোথায় গেল, কখনইবা আসিবে, এই সহজ ও সরল প্রশ্ন তিনটির সদুত্তর দিতে রীতিমত বেগ পাইতে হইতেছে তাঁহাকে। এবং তাহারই ঝাল ঝাড়িতে স্বামীর দরবারে আসিয়া হাজির হন তিনি।

যতীন মুখুজ্যে আলবোলার নলটা মুখ হইতে সরাইয়া কহিলেন—বললে তুমি রেগে যাবে ছোটরাণী, কিন্তু শাসন একটু থাকা দরকার বই কি,—শাসন থাকা দরকার। তোমার যে ছেলেমেয়ের ওপর দাব নেই একেবারে!

অভিমান ভরা কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—শাসনটা তুমি করলেই পারো। আমি এটা করতেও পারি না, সইতেও পারি না।

যতীন মুখুজ্যে বাঁধানো দাঁতে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—সে কথা একশো-বার, ওই তো চোখে জল এসে গেছে। ছি ছি, আচ্ছা পাগল তো! এসো এসো, কাছে এসো।

—কেন, বেশ আছি।

অদূরে একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

—না বেশ নেই, এসো। কেন বুড়ো মানুষকে ওঠাবে?

—কে বলেছে উঠতে।

—বলেছে? বলেছে—ওই দুটি ছল ছল চাউনি, ওই রাঙা রাঙা মুখটি।

—হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর বাজে বোকো না বেশী।

—বুড়ো আর হতে দিলে কই ছোটরাণী! তোমায় দেখলেই তো আমার পঁচিশ বছর বয়স কমে যায়।

—দেখো যেন বার বার দেখোনা, কমতে কমতে শেষে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে—বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া যান জ্যোতির্ময়ী।

—বুড়োকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় চললে?

—যুবোর কাছে, বলিয়া মুচকি হাসিয়া প্রস্থান করেন জ্যোতির্ময়ী।

নাতজামাই একাকী বসিয়া আছে ভাবিয়া তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

কিন্তু আনন্দময় একা ছিলেন না, কাছে ছিলেন অরুণপ্রভা। বিরাট দেহভার বহিয়া তিনি এ অঞ্চলে বড় একটা আসেন না, কোন সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির প্রেরণায় মেদবহুল শরীরটাকে এতটা নাড়া চাড়া করিয়াছেন সেটা প্রণিধান যোগ্য।

সেইমাত্র পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বক্তব্য শেষ করিলেন—তোমরা ভাই পল্লীগ্রামের মানুষ, তোমাদের কথা বাদই দাও, আমাদের চোখেই এসব বেয়াড়াপনা কটু ঠেকে! হ্যাঁ শিক্ষা দেখতে চাও তো দেখগে আমার ঘরে! নিজের মুখে বললে গৌরব করা হয়, ছেলে মেয়েদের সায়েস্তা করতে হয় কেমন করে আমার কাছে শিখে যাওয়া উচিত লোকের।

আনন্দময় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিলেন।

বস্তুতঃ আনন্দময়কে দেখিয়া আনন্দের উদয় হইবার কোনই কারণ নাই, কিন্তু নামের সার্থকতা কয়জনেরই বা থাকে! সমান করিয়া ছাঁটা ছোট ছোট চুলের নীচে পেশীবহুল নীরস মুখ, চোখের দৃষ্টি রুক্ষ রূঢ়। আঁটসাঁট বেঁটেখাটো গড়ন, শুধু রংটা ধবধবে ফরসা বলিয়াই বিশ্রী বলা চলে না। কিন্তু দেখিলে কাছে ঘেঁষিবার সখ বড় একটা হয় না।

জ্যোতির্ময়ী অবশ্য ইহাকে সঙ্গী হিসাবে বাঞ্ছনীয় বলিয়া আসেন নাই, আসিয়াছিলেন নিতান্তই কর্ত্তব্যের তাগিদে। তবে অরুণপ্রভাকে আসর জমাইয়া রাখিতে দেখিয়া বুঝিলেন, না আসিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন অবশ্য চলিয়া যাওয়া যায় না, কাজেই মৌখিক, হাসি টানিয়া কহিলেন—ছোড়দি যে আগে থেকেই নাতজামাইকে দখল করে বসে আছো দেখছি!

—দখল করা-করি আর কি বল? দেখলাম একলা বসে রয়েছে বেচারা- পল্লীগ্রামের লোক এ-অঞ্চলের ধরন-ধারণ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে, তাই দুটো কথা কইছিলাম। যাক যাচ্ছি—নষ্ট করবার মত সময় আমারও বেশী নেই।

টানাসুরে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া অরুণপ্রভা চক্ষুলজ্জার মাথায় পদাঘাত করিয়া জ্যোতির্ময়ীর মুখের সামনেই উঠিয়া যান বিপুল দেহখানি টানিয়া!

—আশ্চর্য্য হবার বিষয় কি দেখলে বলতো ভাই?

সোৎসুকে প্রশ্ন করেন জ্যোতির্ময়ী।

—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের চোখে আপনাদের বড়মানুষী কায়দা—বুঝলেন কিনা, সবই আশ্চর্য্য ঠেকে। এই যে আপনারা আপ-টু-ডেট ছেলে-মেয়ে তৈরী করছেন, আমাদের অঞ্চলে—বুঝলেন কিনা, বয়স্থা মেয়েকে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গেও এক প্রহর রাত অবধি বাইরে হাওয়া খেতে ছেড়ে দেবার রেওয়াজ নেই।

কথাটার অপমানকর ইঙ্গিতে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেলেও জ্যোতির্ম্ময়ী ঠোঁটের হাসি বজায় রাখিয়া কহিলেন—ওইখানেই তো মজা, কেউ বা কুয়োর ভেতরটাই সারা জগৎ মনে করে সুখে কাল কাটায়, কারোর বা পৃথিবীখানাতেও কুলোয় না, আকাশে উড়তে চায়।

জ্যোতির্ম্ময়ীর শ্লেষাত্মক বাক্যের প্রচ্ছন্ন মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আনন্দময়ও জ্বলিলেন, এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—তা যা বলেছেন, আমাদের হচ্ছে সেই কূপমণ্ডুকের দশা, উড়তে শিখলে বোধহয় ভালই হ'ত, শহরে এসে সমাজে কল্কে পেতাম।···আচ্ছা প্রণাম হই।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ শঙ্কিত ভাবে কহিলেন—সে কি প্রণাম কিসের, চলে যাচ্ছো না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—না না, তাই কখনো হয় নাকি? বললে যে থাকবে দু'দিন?

—ভেবে দেখলাম না থাকাই যুক্তিসঙ্গত। দাদামশাইকে নমস্কার দেবেন।

বলিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া যান আনন্দ সান্যাল—প্রত্যেকটি পদক্ষেপে অভিযোগের স্বর ফুটাইয়া।

ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠে জ্যোতির্ম্ময়ীর সারা মুখ। উদ্যত বজ্রের মত সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ক্রোধ, স্থির হইয়া থাকে অনুপস্থিত অপরাধী-যুগলের উদ্দেশে।

এতখানি অপমানিত তিনি জীবনে হন নাই।

আজ প্রথম অনুভব করিলেন মন্দিরা তাঁহার আপন সন্তান নয়, প্রথম বিবেচনা করিলেন—পরের সন্তানকে আপন করায় গৌরব নাই।

অপরাধীরা অবশ্য স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহাদের আচরণে বাড়ীতে এত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন ভাবের উদ্দীপনায় প্রবল তর্কের ঝড় তুলিয়া আসিতেছে তাহারা। শেষ মীমাংসার ভার অবশ্য জ্যোতির্ম্ময়ীর।

বরাবর উভয়ের তর্কযুদ্ধে জ্যোতির্ম্ময়ী যুক্তির বালাইহীন কাঁচা তার্কিকটির পক্ষই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির জোরে তাহার কাঁচা মতটিকে দাঁড় করাইয়া দিয়া প্রবীরকে জব্দ করেন।

কাজেই মন্দিরা—'মা, ও মা-মণি গো" শব্দে বাড়ী সচকিত করিয়া লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিয়া আসিল।

বলা বাহুল্য পিতার কথা তাহার মনেও ছিল না।

স্তব্ধ গম্ভীর মুখে তেমনি বসিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী, মেয়ের ডাকে সাড়া দিলেন না।

সারাবাড়ী ঘুরিয়া অবশেষে এ-ঘরে আসিয়া উভয়েই বিস্মিত ভাবে কহিল—কি হয়েছে মা তোমার?

জ্যোতির্ম্ময়ীর নীরবতায় আরো আশ্চর্য্য হইয়া মন্দিরা পিঠের উপর পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া কহিল—বল না মা, কি হ'ল?

হাত দুইখানা ছাড়াইয়া দিয়া জ্যোতির্ময়ী কঠিন কণ্ঠে কহিলেন—কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

—একটা নতুন জায়গায় মা, রাগ করেছ?

ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করে প্রবীর।

—আমার রাগে কি এসে যাচ্ছে তোমাদের?...মন্দিরা, আজ তোমার বাবা এসেছিলেন জানো?

রৌদ্রে ঝলসাইলে ফুটন্ত ফুলের যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা ঘটে মন্দিরার হাস্যোজ্জ্বল মুখের।

—তোমাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন, আমার অনুরোধ ঠেলে।

মার অনুরোধ ঠেলিয়া যাওয়ার মত অভদ্র কাজ করা যাহার পক্ষে সম্ভব তাহার জন্য সমীহ-বোধ থাকা অনাবশ্যক জ্ঞানে মন্দিরা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—কেন, কী এমন দুর্ব্যবহার করেছি আমরা!

—তিনি আসছেন জেনেও রাত নটা পর্য্যন্ত বাইরে থাকা উচিত হয়েছে তোমার?

অনুচিত হইয়াছে স্বীকার করিতে গর্ব্বে আঘাত লাগে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলভাবে মন্দিরা বলে—তা'তে কি হয়েছে বাপু, আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না? দিব্যি জামাই-আদরে খেয়ে দেয়ে সাটিনের বিছানায় লম্বা হলেই পারতেন—আমার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন বাবা?

—তার কারণ তুমি তাঁরই মেয়ে, আমার নও। সত্যিকার দাবি আমার নেই বলেই অনায়াসে অপমান করে যেতে বাধল না তাঁর। প্রবীরের কাজের কৈফিয়ৎ চাইবার সাহস কি জগতে কারুর আছে? এখন দেখছি তোমাকে এভাবে আদর দেওয়া আমার ভুলই হয়েছে।

এ রকম মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর উক্তিতে মন্দিরার সমস্ত শরীর আলোড়িত করিয়া একটা চাপা কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

—দিও তা'হলে আমাকে বিদেয় করে।—বলিয়া কান্না চাপিতেই বোধ করি দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় মন্দিরা।

প্রবীর ব্যথিতভাবে তাহার গমনপথের পানে চাহিয়া ম্লান স্বরে বলে—তুমি কি পাগল হলে মা? ওটার কি সত্যিই কোন বোধ আছে?

—ওর নেই, তোমার তো ছিল?

—আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে করি না।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া বাহির হইয়া যায় প্রবীর। অবহেলার সুর স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কণ্ঠস্বরে।

স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া থাকেন জ্যোতির্ময়ী।

শিশুর মত আদর করা যায়, কিন্তু শিশুর মত শাসন করা চলে না। হাসে লাফায় ছুটাছুটি করে, আবদারে খুনসুড়িতে অকারণ আনন্দে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়, দেখিলে

মনে হয় ভার নাই, ওজন নাই। কিন্তু এতটুকু অভিযোগের সুর, একতিল শাসনের দৃষ্টি দেখিলেই মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ে সাবানের ফানুসের মত, রঙচঙে আবরণখানা। ভিতর হইতে উঁকি দেয় কঠিন লৌহপিণ্ড।

বড় সাবধানে ঘর করিতে হয় আধুনিক ছেলে-মেয়েদের লইয়া। যেটুকু মান বাঁচাইয়া চলে, সে যেন নিতান্তই করুণা করিয়া—অনায়াসে অপমান করিয়া বসিতে ইহাদের বাধে না। বয়সের মর্য্যাদা, সম্বন্ধের মর্য্যাদা দূরে থাক, স্নেহের সম্মানটুকুও রাখিতে জানে না ইহারা।

সত্য বটে—এমন কিছুই বলে নাই প্রবীর, কিন্তু তাহার গলার স্বর, চোখের চাহনি, প্রতিটি পদক্ষেপ জানাইয়া দিয়া গিয়াছে প্রয়োজন হইলে অনেক কিছুও বলা অসম্ভব নয়।

সহসা নিজের পানে চাহিয়া দেখেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

এই দীর্ঘ জীবন নির্ব্বিরোধ শান্তিতে কাটিয়া গেল কিসের অনুশাসনে? প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিদ্রোহ মাথা তুলিতে চাহিয়াছে—তাহাকে পিষিয়া মারিয়াছে কোন শাস্ত্র-মন্ত্র?

যে নতুন বৌ বৃদ্ধ যতীন মুখুজ্যের শয্যাপার্শ্বে ধরা দিয়াছে সে কি জ্যোতির্ম্ময়ী?

তবু এ অভিনয়ও নয়, ছদ্মবেশও নয়। রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে নম্রতা, যে বাধ্যতা, অদৃষ্টকে মানিয়া লইবার যে শিক্ষা, এ শুধু তাই।

আধুনিক ছেলে-মেয়েরা চলে আপন আপন হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া। কিন্তু কোনটা ভাল? জিতিল কাহারা?

দিন কয়েক পরের কথা। অমরেশ আসিয়াছিল মন্দিরা ও প্রবীরের খোঁজে। প্রবীর তাহাদের সমিতিতে দুই-তিন দিন গিয়াছিল মাত্র, কিন্তু মন্দিরা মহোৎসাহে দুই বেলা যাতায়াত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই দিন একেবারে চুপচাপ। কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে সেটা সমিতিই জানে, কিন্তু হৃদয়টা কি বড় বেশী অগ্রসর হইতেছে না? নিত্য দুই বেলা সমিতির অফিসে যাইবার যে প্রেরণা তাহাকে ঠেলা মারিয়া বাহিরে পাঠায়, সেটা যথার্থই পরোপকার স্পৃহা কিনা, সেটা যাচাই করিতেই বোধহয় মন্দিরা দুই দিন আপনাকে দমন করিয়াছিল। অমরেশ আসিয়া হাসিয়া কহিল—'মেয়েদের অফুরন্ত কর্ম্মপিপাসা' কি মিটে গেল নাকি?

মন্দিরা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিল—খুব নিন্দে কচ্ছেন!

—কেন করব না?

—বেশ করুন, যত খুসী। আমি এদিকে অসুখে মরে যাচ্ছিলাম, একবার খোঁজও তো নিলেন না?

—অসুখ করেছিল?—অনুতপ্ত হইয়া উঠে অমরেশ। কি আশ্চর্য্য, প্রবীর তো বললে না একদিনও!

অবশ্য ও-অনুযোগের কোন কারণ ছিল না, প্রবীর বাড়ীর কোন কথা কখনো আলোচনা করে না।

তবু মন্দিরার অসুস্থতার সংবাদ না জানা যেন কেমন অন্যায় অপরাধ বলিয়া মনে হয় অমরেশের। কি সূত্রে কখন যে এই আত্মীয়তা স্থাপন হইল সেটুকু ভাবিয়া দেখিবার স্থৈর্য্য হয়তো ছিল না। শুধু অমরেশের মনে হয়—মন্দিরার মুখখানি শুক্‌নো, হাসি ম্লান, আগের চাইতে যেন অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে সে।

ব্যথিত স্বরে বলে—কই, কি হয়েছিল বললে না তো?

অসুখের ছলনাটুকু অবশ্য মন্দিরার বানানো, কিন্তু এই সামান্য মিথ্যাটুকু যদি এমন কাজে লাগানো যায়, ক্ষতি কি?

—সে জেনে আপনার লাভ? শুনলে কি দেখতে আসতেন?

—দেখতে? হয়তো আসতাম না মন্দিরা, কিন্তু দেখতে আসাই কি সব? দেখতে না আসার মধ্যে কি কিছুই থাকতে পারে না?

এই স্থির অকম্পিত দৃষ্টির সামনে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না মন্দিরা। খেলাচ্ছলে কথার জাল বুনিয়া দীর্ঘপথ চোখ বুজিয়া পার হওয়া সহজ, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোই কঠিন।

তাই সহসা কাঁপিয়া ওঠে সে।

অমরেশ উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকিয়া ম্লানস্বরে বলে—রাগ করলে মন্দিরা?

—বাঃ কেন?

—ভাবছো লোকটার কী স্পর্দ্ধা? কিন্তু বলবার সাহস যদি দাও তাহলে বলবো—হয়ত দেখতে আসতাম না, কিন্তু আমার সমস্ত দিন-রাত ভরে থাকতো সেই মধুর কল্পনায়। অন্য কোন অধিকার না থাক, কল্পনা করার অধিকার তো কেউ বন্ধ করতে পারে না?

—বা-রে, অসুখ করলে দেখতে আসবেন—তা'র আবার অধিকার অনধিকার কি? কি যে মাথামুণ্ডু বকেন আপনি।

অমরেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে মন্দিরার মুখের পানে। সত্যই কি এত ছেলেমানুষ সে, না আপনাকে লুকাইবার এ সকল ছল মাত্র। অমরেশ কি বড় বেশী বোকামি করিয়া ফেলিয়াছে?

এত অল্প পরিচয়ে এত কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা পাগলামি নয় তো?

কিন্তু এই সামান্য পরিচয়ে হৃদয়াবেগে এমন অসামান্য হইয়া উঠিল কেন অমরেশ? গরীবের এ কি আকাশকুসুম কল্পনা?

তাড়াতাড়ি আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অমরেশ বলে—আচ্ছা তোমার যখন শরীর ভাল নয় তখন তো যাওয়া হতেই পারে না। প্রবীর এলে বোলো।

—চলে যাচ্ছেন বুঝি? বসুন না আর একটু—দাদাভাই আসবেন এখুনি।

আপনাকে আড়াল করিতে একখানা খবরের কাগজ মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে অমরেশ যেন প্রবীরের প্রতীক্ষায়। আর মন্দিরা অকারণ টেবিলের এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করিতে থাকে। কথাও যোগায় না, চলিয়া যাইতেও পারে না।

হঠাৎ চমক ভাঙে কুমুদ ঝির ব্যস্ত ডাকে—

—দিদিমণি তুমি হেথা? সেই থেকে খুঁজতেছি—দাদাবাবু কম্‌নে গেল?

—দাদাভাই নেই তো, কেনরে কুমুদ?

—তুমি একবার এস দিকিন যদি ডাক্তারবাবুকে টিলিফোন করতি পারো—বড়বাবু কেমন যেন করতেছে!

—সে কি?...কেনরে?...কখন?

কুমুদের ভয়ার্ত্তভাব মন্দিরার মুখ পাংশু করিয়া তোলে।

—এই খানিক আগে ছোটমার কাছে বুঝি জল চায়লো, জল এনে দেখে ঘাড় গুঁজে ঢুলতেছে, সাড়াও দেয় না, চোখও খোলে না—

রুদ্ধকণ্ঠে অমরেশকে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া মন্দিরা ছুটিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

তখন চাকররা ধরাধরি করিয়া চেয়ার হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছে যতীন মুখুজ্যেকে।

জ্যোতির্ম্ময়ী তখনো অসহায় সুরে ডাকিতেছেন—শুনছো ওগো, কি, কষ্ট হচ্ছে? শুনছো?

কিন্তু যতীন মুখুজ্যে আর শুনিলেন না। সাধের ছোটরাণীকে ফেলিয়া সুদীর্ঘকাল পরে বোধকরি পলাতক বড়রাণীর অভিমান ভাঙ্গাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন তখন।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিতেই কৃষ্ণবালা স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—তুই আবার কি করতে মরতে ওদের মড়ায় কাঁধ দিতে গেলি অমরেশ? বড় মানুষের সেথোর অভাব কি?

—অভাব না থাকলে যেতে নেই?—বলিয়া আরতি প্রদত্ত শুক্‌নো কাপড়খানা হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলে অমরেশ।

—যেতে থাকবে না কেন, ভাব-ভালবাসা থাকলে সবই আছে।...ভাব ভালবাসার উপর একটি বিশেষ সুর বসাইয়া কৃষ্ণবালা কথাটার উপসংহার করেন অন্য প্রশ্নে।...মিনসের কি হ'ল হঠাৎ?

—হার্টফেল করলেন।

—তা বুড়োর বয়েস কম হয়নি—এ পক্ষের বৌ নিয়েই বিশ-পঁচিশ বছর ঘর করলো। টাকার কুমীর ছিল মিনসে, ওই ছোটগিন্নীর ছেলেটাই বোধ হয় সব গ্রাস করবে? নাকি ও পক্ষের মেয়ের যে নাতনী ছুঁড়িটাকে মানুষ করেছে সেটাকেও দেবে-থোবে কিছু?

—আমি অত কথা জানবো কি করে?—বিরক্তভাবে উত্তর করে অমরেশ।

—কেন, ছুঁড়ির সঙ্গে তো তোর খুব ভাব শুনতে পাই, আমাদের মেনি বলছিল 'বুড়োর মরণকালে—'অমরেশেদা অমরেশদা' করে ছুঁড়ির কী ঢলাঢলি!" মেনির সই পদ্ম বুঝি গেছল রগড় দেখতে।

—মানুষের মরণকালে যারা রগড় দেখতে যায়, তাদের গলায় দেবার দড়ি যদি না জোটে

পিসীমা, বোলো আমি নিজের পয়সায় কিনে পাঠিয়ে দেব। আর তোমারও একগাছা—বলিয়া কৃষ্ণবালাকে মূক করিয়া দিয়া সশব্দ পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া যায় অমরেশ।

পিসীমার বিদ্রূপকুঞ্চিত কদাকার মুখের পানে চাহিতেও ঘৃণা বোধ হয় তাহার। এই অভদ্র ইতর নির্লজ্জ মানুষটাকে এতকাল ধরিয়া ভয় সমীহ তো দূরের কথা, সহ্য করিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য লাগে অমরেশের।

কৃষ্ণবালা রুদ্ধ আক্রোশে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করিয়া পাড়ায় বাহির হইয়া যান বিষ উদগীরণ করিতে।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে ও বাড়ী হইতে মেনকা আসিল বেড়াইতে।

—অমরেশদা বুঝি বাড়ী নেই, বৌদি?

আরতি তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া কহিল—বোসো ঠাকুরঝি।

—না আর বোসব না, আজ আবার তোমার ননদাইয়ের আসবার কথা আছে (সংবাদটা অবশ্য কাল্পনিক), দাদা একটা কথা বলতে বলেছিল তাই—তা' অমরেশদা বুঝি বাড়ী নেই?

—হ্যাঁ, আছেন তো—এই এলেন শ্মশান থেকে, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন বোধ হয়—লাল বাড়ীর বড়কর্ত্তা মারা গেলেন কিনা।

—হ্যাঁ, পদ্ম তাই বলছিল—ধন্যি বাড়ী বাবা! মানুষটা মরে গেল একটু টু-শব্দ নেই, বেহ্ম নাকি? বড়-মানুষের শোকও কম, কি বল বৌদি?

আরতি বিব্রত ভাবে বলে—আস্তে আস্তে কেঁদেছেন বোধ হয়। সবাই কি আর—

—ওমা, তোমারও যে বেহ্মজ্ঞানীর মতন কথা হ'ল বৌদি। কথায় বলে মড়াকান্না! কেউ না কাঁদুক, মাগী তো কাঁদবে মাথা-মুড় খুঁড়ে? দ্বোজপক্ষের বৌয়ের আদর তো ছিল খুব শুনতে পাই। বুড়ো-হাবড়া যাই হোক স্বামী তো! মাছ খাওয়া, সিঁদুর পরা উঠে গেল তো জন্মের মতন? তবে? বাবা মরতে—আমার মার কাণ্ডখানা মনে করো দিকিনি? সাতটা মানুষে ধরে রাখতে পারে না, হিমসিম খেয়ে গেল এমন অবস্থা! কপাল ফেটে রক্ত-গঙ্গা, বুক চাপড়ে ছড়া-ছড়া কালসিটে, মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিন ভাগ শেষ। কান্নার শব্দে বোধহয় তিন পাড়ার লোক জড় হ'ল। তা'কেই বলি শোক!

যথার্থ শোকের আসল নমুনার বৃত্তান্তে আরতির অত্যন্ত হাসি পাইতেছিল, তাড়াতাড়ি কহিল—ঠাকুরপোকে কি বলবে বলছিলে?

—বলবো তো বলছিলুম, তুমি আবার বলছো শুয়ে আছে!

—শুয়েছেন, ঘুমোন নি বোধহয়। যাওনা ওপরে।

—কি জানি ভাই, আমার কেমন পুরুষ মানুষের শোবার ঘরে একলা যেতে গা ছম্‌ছম্ করে।

বলিয়া বিড়ালীর মত লঘু সতর্কপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যায় মেনকা।

আপাদমস্তক একখানা র‍্যাপার ঢাকা দিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল অমরেশ, সহসা গায়ের উপর মানুষের স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া মুখ খুলিতেই চোখে পড়িল মেনকার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধা কুশ্রী মুখখানা।

এইমাত্র না কি মেনকার সখা পদ্মর নির্লজ্জ মন্তব্যটা মনের মধ্যে বিষ ছড়াইতেছিল, তাই মেনকাকে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বিরক্তিপূর্ণ কটুকণ্ঠ মোলায়েম করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অমরেশ কহিল—কি দরকার?

—দাদা বলতে বলেছিল—

দাদার বক্তব্যটাও অবশ্য মেনকার নিজস্ব কল্পনা, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হয়। গুছাইয়া মিথ্যা বলিবার জন্যও যেটুকু বুদ্ধির আবশ্যক, সেইটুকুর অভাব ছিল তাহার মধ্যে।

—কি বলেছে দাদা?—রুক্ষস্বরেই প্রশ্ন করে অমরেশ।

মেনকা বোধকরি এরূপ অভ্যর্থনার আশা করে নাই, তাই কোটরগত ক্ষুদ্র চোখ দুইটিতে অভিমানের ছায়া ফুটাইয়া তুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে উত্তর করে—কিচ্ছু বলেনি দাদা, শুধু শুধু বকছো কেন আমায়, বাঃ রে!

এই ন্যাকামী, এই আদিখ্যেতা মেনকার স্বভাবধর্ম্ম, সুযোগ পাইলেই ন্যাকামি করিবে সে। করিবে ওই যুবক বয়সের ছেলেদের কাছেই।

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই গালে দুই চড় বসাইয়া দিবার প্রবল ইচ্ছাকে কষ্টে দমন করিয়া, "দরকার না থাকে তো নীচে যা"—বলিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শোয় অমরেশ।

মেনকা কিন্তু বসিয়াই থাকে।

পাউডার লেপা হাড়উঁচু গালের উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়ে।

অবস্থাটা যন্ত্রণাদায়ক। হাজার হইলেও পায়ের কাছে বসিয়া একটা মেয়েমানুষ অশ্রুপাত করিতেছে, এটা পুরুষমানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অস্বস্তিও কম নয়, পিসীমার চোখে ছবিখানা পড়িলে?

অমরেশ উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ নরম সুরে বলে,—খামোকা কান্না জুড়ে দিলি যে? কি বলেছে দাদা—আমায় কেটে রক্ত দর্শন করতে?

—তাই বুঝি, বা!

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে মেনকা।

অবাক হইয়া যায় অমরেশ, মেনকা কি পাগল? উহার আচরণে সঙ্গতি-অসঙ্গতির বালাই নাই কেন!

—আমাকে কেউ দেখতে পারে না অমরেশদা, সবাই আমায় ঘেন্না করে, কপালটাই মন্দ আমার, বড় দুঃখিনী আমি।

—শচীনের চিঠি পাসনি বুঝি এখনো? যা দিকিনি, গুছিয়ে গাছিয়ে পাতা আষ্টেক চিঠি লিখে ফেলগে যা, মন ভালো হয়ে যাবে।—অমরেশ হাসিয়া ফেলে।

—সে আর আমাকে নেবে না অমরেশদা, আমায় ত্যাগ দিয়েছে—আমার কি হবে ভাই ?—বলিয়া সহসা দুইহাতে অমরেশের পা চাপিয়া ধরে মেনকা।

—পাগলামি করিসনে মেনি, বাড়ী যা—

বলিয়া নিজেই উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায় অমরেশ।

শুধু মেনকাকে ঘেন্না করা নয়, সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটার উপরই অদ্ভুত বিতৃষ্ণা-বোধ আসে তার। বসিয়া থাকিতে পারে না অমরেশ, পায়চারি করিয়া বেড়ায়। সীমাবদ্ধ চারখানা দেওয়ালের ভিতর সে নিজেও যেমন পাক খাইতে থাকে, মনের মধ্যেও তেমনি সহস্র চিন্তার জট ওই একটা বস্তুকেই কেন্দ্র করিয়া পাক খাইয়া মরিতে থাকে।

পিসীমা, ঊষা, মেনকা ও-বাড়ীর বড়জ্যেঠি, ছোটখুড়ি, আরতি, জ্যোতির্ম্ময়ী, মন্দিরা, সব এক ছাঁচে ঢালা, এক মাল-মসলায় গড়া সব। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে বাহিরের খোলসটার প্রভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। সমর ঠিক কথাই বলে।

—ওয়ার্থলেস !

চিন্তার সশব্দ অভিব্যক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক কথায়—এই একটিমাত্র সংজ্ঞা আছে মেয়ে মানুষের।

সতীত্ব গর্ব্বে গরবিণী কৃষ্ণবালার সর্ব্বত্র সন্দেহ দৃষ্টি, বড়জ্যেঠির অহরহ মালা জপা, ঊষাবতীর পান-দোক্তা গালে ঠেসিয়া ধর্ম্মকথার আলোচনা, বেয়াল্লিশ বছর বয়সে নূতন সন্তানের জননী ছোটখুড়ির জোয়ান ছেলের বিবাহে অনাসক্তি লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ, আরতির সন্ন্যাসী স্বামীর ধ্যানের আয়েসের জন্য প্রশমের আসন বোনা, আর মেনকার যখন-তখন অকারণ ভাবালুতার মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই।

ন্যাকামি !

সাদা বাংলায় এ ছাড়া আর কোনো নাম নাই ইহার—এমন থাপ্ খাওয়া লাগ্সই নাম।

রূপসী জ্যোতির্ম্ময়ীর বৃদ্ধ স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া থাকায় যে নিঃশব্দ শোকের মূর্ত্তি কিছু পূর্ব্বে তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দৃশ্য কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ ভারী হাসি পায় অমরেশের। আরো হাসি পায়—মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে সে নিজেই মন্দিরার মত রাঁবিশ মেয়ের কাছে গদগদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করিতে বসিয়াছিল ভাবিয়া।

পদার্থ বলিয়া কিছু আছে নাকি মন্দিরার ভিতর ?

পদ্মার বলিবার ভঙ্গীটা হয়তো শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে অমরেশ নিজেই কি মন্দিরার অধৈর্য্য আচরণের ওই একই ব্যাখ্যা করিবে না ?

তখনকার বিসদৃশ দৃশ্যটা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জায় কান রাঙ্গা হইয়া উঠে।

নীচে তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় আরতির সামনে বিস্ফারিতচক্ষু মেনকা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিতেছিল—হাতখানা চেপে ধরে মুখের দিকে এমন হাঁ করে চেয়ে রইল অমরেশ দা,

লজ্জায় যেন মরে গেলাম! বলে কিন'—'পা দুটো একটু টিপে দিবি মেনি'—ভয়ে বুক দুর-দুরিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাইনা, মাগো!

প্রতিবাদকল্পে আরতি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সহসা পিসীমা পিছন হইতে কঠোর কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—বটে নাকি লা মেনি? বলি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার ঘরের ছেলে গিয়েছে তোর সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে? রূপের ছটায় সোয়ামীতে ভয় পায়—তোকে রুচি যে যমেও করবে না লো! তুই তাই এখনও ভাবন কেটে, টিপ-কাজল পরে লোকের কাছে মুখ দেখাস, অন্যে হলে গলায় দড়ি দিত!

কৃষ্ণবালা নিজে অবশ্য কোনো ছেলে-মেয়েকেই বিশ্বাস করেন না, ঘরের হইলেও না, তাই বলিয়া অন্যে বলিলে সহিয়া যাইবেন?

মেনকা পাংশু মুখে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

সহসা উপর হইতে নামিয়া আসিল অমরেশ, পিসীমা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—

—এই শোনগো বাছা তোমার ভালমানুষ বৌদির গুণ, ফিস্ ফিস্ করে দুটিতে মিলে তোমার কুচ্ছো করা হচ্ছে—আমি যত বজ্জাত, আর সব সগ্‌গের দেবী! বলি এখন বিশ্বাস হ'ল তো?

—অসম্ভব নয়, মেয়েমানুষ তো—বলিয়া যুগপৎ সকলের উপর একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া চটি জুতাটা পায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া যায় অমরেশ।

॥ পাঁচ ॥

সমরের কিছুই ভালো লাগে না।

সমস্ত জগৎটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। ভাঙিয়া গুঁড়া করিতে পারিলে আক্রোশ মেটে।

কিন্তু এত অশান্তি কেন? এত আক্রোশ কাহার উপর? কেন তাহার সমস্ত চেতনা উদগ্র হইয়া থাকে অপরকে আঘাত করিতে?

সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধরাছোঁয়ার উপায় নাই বলিয়াই কি তাঁর সৃষ্টবস্তুর উপর দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে চায়?

সমর নিজেই জানে না যন্ত্রণার মূল উৎস কোথায়।

মোটের উপর কিছুই ভাল লাগে না তাহার।

ছোট কথা, ছোট কাজ, ছোট সুখ, ছোট আশা, ছোট আবেষ্টন, আর ছোট মানুষগুলার মাঝখানে তার বিরাট প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

কেবলমাত্র একটা বিধবা দিদির মুখ চাহিতে সংসারে আটকাইয়া থাকার কোন অর্থ হয়?

যুদ্ধে যাইবার চেষ্টা করিয়া বেড়ায় সমর।

ভাতের থালাটা সামনে ধরিয়া দিয়া সেই কথাই উত্থাপন করিল উষা।

—হ্যাঁরে সমর, তুই নাকি যুদ্ধে যাবি বলেছিস?

—বলেইছি তো—তোমায় কে বললে ?

—ওদের গোরা বলছিল—খবরদার ওসব ঝুমতলব করিসনে বাপু, সর্ব্বনেশে কথা শুনলেও গা কাঁপে !

—তোমার তো আরশোলা দেখলেও গা কাঁপে। যুদ্ধে আমি যাবোই, সব ঠিক করে ফেলেছি।

—ভালই করেছিস, যাবার আগে আমায় একতাল আফিং কিনে দিয়ে যাস, একটি কথাও কইতে আসব না।—বলিয়া ভারী মুখে উঠিয়া যায় উষা।

এই উষাকে লইয়াই এক জ্বালা সমরের।

মা-বাপ-ভাই-ভগ্নীপতি সকলে মিলিয়া একযোগে শত্রুতা সাধিতে এই বিরাট বোঝাটি সমরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, তাই মাথা তুলিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না বেচারা।

এত বড় পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে সমরের ঘাড়ের বোঝা হালকা করিয়া দিতে পারে।

অথচ বসিয়া বসিয়া উষার হাতের পরিপাটি করিয়া রাঁধা শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, শুক্ত, চচ্চড়ি খাইয়া শুধু দিনের পর দিন কাটাইয়া দেওয়া দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার পক্ষে।

অহরহ অশান্তি তাহার।

বিজয় মল্লিক বলে—কাজে নেমে পড সমর, সব ঠিক হয়ে যাবে। দুঃখীর দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারলেই নিজে শান্তি পাওয়া যায়!

—কাঁচকলা পাওয়া যায়, তোমার মাথা পাওয়া যায়।

এত ছোট স্কীমে এই সব ছোট ছোট কাজ দেখিলে হাসি পায় সমরের, বলে—এ হতভাগা দেশের দুঃখ ঘোচাবার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নেই, বুঝলি ? তুই যা নিয়ে অগাধ আত্মপ্রসাদ লাভ করছিস, আসলে সে একটি অশ্ব ডিম্ব! লোকের দোরে দোরে দু'মুটো চাল ভিক্ষে করে যদি এই বুভুক্ষিত দেশের পেট ভরতো তা'হলে ভাবনা ছিল না। তাছাড়া শুধু পেট ভরাতে পারলেই বুঝি সব হ'ল ? কোন প্রকারে দুটো অন্ন জোটা—শুধু এই! এতেই সকল দুঃখ মোচন হয়ে যাবে এই তোর ধারণা ? আর কোন অভাব নেই মানুষের ?

বিজয় মল্লিক মূঢ়ের মত বলিয়া ফেলে—কেন, শুধুই পেটের ভাত কেন, পরণের কাপড়, শীতের কম্বল, মাথা গোঁজবার আস্তানা, সবই যোগাবো আমরা আস্তে আস্তে।

—কেন, শুধু শীতের কম্বল কেন ? 'রাতের সম্বল' চাইনা একটা করে ? একটা বৌ ? সেটাই বা বাকী থাকবে কেন ?

রূঢ় ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে হাসিয়া ওঠে সমর।

—ঠাট্টা করছিস ?—আহত হয় বিজয় মল্লিক।

—ঠাট্টা! মোটেই না, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ। তোমাদের এই 'আর্ত্তত্রাণ সমিতি' আর 'অনাথবন্ধু ভাণ্ডার' গোছের ব্যাপারগুলো দেখলে হাসি পায় না বিজয়, ঘেন্না করে। তাছাড়া এই যে দয়া, এই যে করুণা, এটা দিনে দিনে মানুষকে কত নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা ভাবতে পারো ? নিজের অক্ষমতার ফল নিজে ভোগ করবে না কেন মানুষ ? কেন আশা করবে অপরের ওপর ? কেন চাইবে দয়া ?

—বাঃ, মানুষ মানুষের কাছে দয়ামায়ার আশা করবে না?

—না, করবে না। বোমা আমাদের ততটা সর্ব্বনাশ করতে পারবে না বিজয়, যতটা করেছে এই দয়া। তারাও ডুবছে, তোমাকেও পাঁকে পুঁতছে!

বিধবা হইবার পর হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীর আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বারব্রত পূজা-অর্চ্চনা দানধ্যানের তালিকা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, যেখানে এক বেলা উপবাস দিলে চলে, সেখানে তিন বেলা উপবাসের ব্যবস্থা।

কৃচ্ছ্রসাধনের এ এক অদ্ভুত মোহ!

ছেলেমেয়েরা রাগ-দুঃখ করিলে শুধু মৃদু হাসি হাসিয়া তাহাদের চুপ করাইয়া দেন।

অরুণপ্রভাও অনুযোগ করিতে ছাড়েন না, আজকাল প্রায়ই তিনি এ অঞ্চলে যাতায়াত করেন। ঐদিনও, ভাসুরের শ্রাদ্ধে পাঁচজন আসিবে বলিয়া যে হাতাপাড়ের ফরাসডাঙার শাড়ী জোড়া কিনিয়াছিলেন, তাহারই একখানা পরিয়া হেলিতে দুলিতে এধারে আসিয়া কহিলেন—নতুনদির আজও উপোস নাকি?

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—আশ্চর্য্য! বিধবা আর কোন মেয়ে মানুষটা না হচ্ছে বল? সিঁদুর তো কেউ লোহা দিয়ে বাঁধিয়ে আসেনি—কিন্তু তোমার যে অনাসৃষ্টি বাড়াবাড়ি!

কিছু বলা আবশ্যক বোধে জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—উপোস দিলে শরীর ভালো থাকে ছোড়দি!

—সে তো চেহারা দেখলেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রবীরের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত।

—প্রবীর কি করবে?

—বারণ করবে। উপযুক্ত ছেলে, তার মতামতটা তো তোমায় মেনে চলতে হবে? না না, এ হাসির কথা নয়, অবশ্য তুমি যদি না মানো সে আলাদা কথা। এই বড়ঠাকুর যখন আবার বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপলেন, কারুর মানা শুনলেন কি? সতীরাণীর কত কান্নাকাটি। কিছুই মানলেন না। মরে গেছেন স্বর্গে গেছেন, তাঁর নিন্দে করা ঠিক নয়, তবে ভয়ানক একজেদি ছিলেন তিনি। সেইটি এখন দেখছি তোমায় বর্ত্তেছে। তা এই যে মাসে পাঁচ-সাতশো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে বাজে খরচে বামুন পুরুতের পেটে, সেটা কি ঠিক হচ্ছে?

মমতার আসল উৎস কোথায় সেইটি অনুমান করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ দৃঢ়স্বরে কহিলেন—এতে আর মানা করবার কথা ওঠে কেন ছোড়দি? তিনি কিছু কম রেখে যান নি যে, আমি দু'পাঁচশো খরচ করলে প্রবীরের ভাগে টান পড়বে।

—তা অবশ্য বলছি না আমি, তাছাড়া কত রেখে গেছেন সে খবর আমরা কি করে জানবো বলো? কারবার তো তিনিই সমস্ত দেখতেন, ইনি তো কোর্ট-কাছারী নিয়েই ব্যস্ত, কারুর সাতে পাঁচে নেই, তবে বলছিলেন সেদিন কথাচ্ছলে, আইনে নাকি বলে—এক ভিটেয় এক অন্নে যতক্ষণ থাকা যায়, যে যা আয় করুক সকলেরই সমান ভাগ থাকে। জয়েন্ট

ফ্যামিলির এই বুঝি আইন। যাক, তার জন্যে আমি কিছু ইয়ে করি না, আইনে যদি থাকে অবশ্যই তা রদ হবে না। কিন্তু এমনভাবে কাঁচা পয়সাগুলো এরকম বাজে খেয়ালে নষ্ট হতে দেওয়াও আর উচিত মনে করছি না।

এসব কথার জন্যে জ্যোতির্ময়ী একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

সত্যই যে তিনি স্বামী হারাইয়া শূন্য হৃদয়ের হাহাকার লইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে ছুটিতেছিলেন এমন নয়। বিধবা হইলে ধর্মকর্ম করা উচিত এই এক সংস্কার।

তাছাড়া অবসর প্রচুর, কাজ অল্প। অর্থের অগাধ স্বাধীনতা, এ এক নতুন খেলার আস্বাদ দিয়াছে। হয়তো আরও গোপনে, নিজের অজ্ঞাতসারে লুকানো আছে, চিত্তদৈন্যের ক্রটিপূরণ।

স্বামীর বিরহে যতটা কাতর হওয়া উচিত সে কাতরতা মনের মধ্যে খুঁজিয়া পান কই? নূতন করিয়া কোন শূন্যতা আসিল জীবনে?

শুধু অবসর! দিনরাত্রির অনেকখানি সময় যাহার জন্য উৎসর্গ করা ছিল, তাহার অভাবে হঠাৎ অবসর বাড়িয়া গিয়াছে প্রচুর।

অরুণপ্রভা জ্যোতির্ময়ীর অসহায় আত্মবিস্মৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া আর কথা বাড়াইলেন না।

প্রথম নম্বর হোমিওপ্যাথি ডোজ দেওয়াই ভালো।

আহারের সময় জ্যোতির্ময়ী প্রবীরকে সোজাসুজিই প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে প্রবীর, আমি যে এই আমার বাজে খেয়ালই বলি, পুজোপাঠে কিছু খরচপত্র করি এটা কি অন্যায় হচ্ছে?

—সে কি, একথা বলছ কেন মা?

আশ্চর্য্যভাবে প্রশ্ন করে প্রবীর।

—এতে তো তোর কমে যাচ্ছে?—ঈষৎ হাসেন জ্যোতির্ময়ী।

প্রবীর স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া কহিল—এটি তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে বলতে পারো? ছোটখুড়ি বোধ হয়?

—কেনরে আমার মাথায় কি বুদ্ধি একেবারেই নেই?

—আছে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি নয়। আমার কমে যাওয়ার কথা বলছো—ঠিক যদি বিশ্বাস করো মা, আমি কোন দিনই মনে করতে পারি না যে এ সব আমার। বাবাকেও যেন মনে হ'ত বড় বেশী দূর, প্রায় পরের মতন, তাই বাবার টাকাতেও কোন অধিকার-বোধ জন্মায় নি।

এ-তথ্যের সন্ধান কিছু অিছু রাখিতেন জ্যোতির্ময়ী। ছেলের এই এড়াইয়া যাওয়া ভাবটা স্বামীকে যে পীড়া দিত, সেটা অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি। তাহার জন্য লজ্জাও করিত সময় সময়।

ব্যথিত করুণার সুরে কহিলেন—এটায় কিন্তু 'উনি' বরাবরই মনঃক্ষুণ্ণ হতেন প্রবীর।

—হ্যাঁ, এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সে কথা। যাক্ গে, কিন্তু তোমায় অভয় দিয়ে রাখছি মা, টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে মামলা করতে বসব না। যত খুসী টাকা তোমার ওই ভট্চায মশাইয়ের গোদা পায়ে ঢেলো, কিন্তু দোহাই তোমার, এই উপোসটা একটু

কম করো। পিতৃহীন হওয়াটা সয়েছে, মাতৃহীন হওয়াটা চট করে বরদাস্ত করতে পারব না।

জ্যোতির্ময়ী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—সবই সয়ে যায় রে প্রবীর, কিছুই অসহ্য হয় না মানুষের।

প্রবীর গম্ভীর হইয়া গিয়া বলে—তা ঠিক, আর একটা কষ্টকর জিনিসও হয়তো শীগগির সইতে হবে, কাল থেকে তোমায় 'বলবো বলবো' করে বলা হচ্ছে না—বলিয়া বাম হাতে পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি বাহির করিয়া দিল।

পত্র লিখিয়াছেন আনন্দময়। লিখিয়াছেন অবশ্য প্রবীরকেই। তবে হিসাব মত জ্যোতির্ময়ীর উদ্দেশেই লেখা। তিনি সবিনয়ে জানাইয়াছেন—অতঃপর মন্দিরাকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, কারণ এতদিন যাঁহার ভরসায় মেয়েকে চোখের আড়ালে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই যখন নাই, তখন আর—তা'ছাড়া, যাঁহারা মেয়েকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইয়া উঠিবেন এইরূপ ধারণা তাঁহার ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন দেখা যাইতেছে 'ধিঙ্গি' করিয়া তুলিয়া পরের মেয়েটির মাথা খাওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তখন মানে মানে মেয়ে লইয়া সরিয়া পড়াই ভালো। দাদামহাশয়ের অবর্তমানে আরো কত বেচাল বা চাল বাড়িতে সুরু করিয়াছে এই আশঙ্কায় দিশাহারা হইয়া পত্রখানি লিখিয়া ফেলিয়াছেন তিনি।

বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিতে ভাষা যতদূর প্রাঞ্জল ও যুক্তি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত তাহার ত্রুটি করেন নাই ভদ্রলোক, পরিশেষে জানাইয়াছেন—অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া না হইলে তিনি নিজেই আসিয়া লইয়া যাইবেন। কারণ আইন তাঁহার পক্ষে।

পড়া সাঙ্গ করিয়া জ্যোতির্ময়ী নীরবে চিঠিখানা আবার খামের ভিতর ভরিয়া ফিরাইয়া দিতেই প্রবীর কহিল—কই বললে না কিছু?

—কিছু তো বলবার নেই বাবা!

—কি উত্তর দেওয়া যাবে?

—লিখে দিও রেখে আসবার সময় কারো হবে না, তিনি যেদিন ইচ্ছে এসে নিয়ে যেতে পারেন।

—বল কি মা! আইন দেখালেই হ'ল অমনি? প্রতিপালনের দাবি নেই একটা? নিয়ে যেতে বলছো, মানে?

—ঠিকই বলছি রে, উনি যেতে যেতেই কি ঘরে-বাইরে আইনের মারপ্যাঁচ্ নিয়ে লড়তে বসবো? তোর কাকার যদি সত্যিই দাবি থাকে তো তিনি যেন চুল চিরে ভাগ করে নেন, মন্দিরাকেও নিয়ে যাক আনন্দ, আমি নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে তীর্থধর্ম করে বেড়াই।

—চমৎকার! আদর্শ ভারত নারী! বাস্তবিক কতটা আত্মজ্ঞান লাভ হলে এত সহজে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায় তাই শুধু ভাবছি মা!

প্রবীরের রাগে হাসিয়া ফেলিলেও পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া জ্যোতির্ময়ী কহিলেন—তা

হোক, ওছাড়া আর কিছু উত্তর দেওয়া যাবে না প্রবীর, আনন্দময় লোক ভাল নয়, বাধা পেলে রাগের মাথায় নিজের মেয়ের নামে বদনাম দিয়ে বসতেও ওর বাধবে না।

—পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারবে ?

—পারবনা বললে চলবে কেন বাবা ? মেয়েকে তো শ্বশুরবাড়ীও পাঠাতে হয়। সে তো নিতান্তই পরের বাড়ী, আর এতো তবু ওর নিজের ঘর।

—ছাই নিজের। ওই লক্ষীছাড়াটা ওর বাপ, মনে করলে আমার হাড় জ্বলে যায় মা। কিন্তু সে যাক, মন্দিরাকে এ কথা বলবে কে ? সেটাও বোধ করি আমার ঘাড়ে ?

—না বাবা, আমিই বুঝিয়ে বলবো ওকে, তুই চিঠিখানা রেখে যা।

—বেশ, যা খুসী করো, আমিও একদিন অমরেশের মত কেটে পড়বো দেখো।

॥ ছয় ॥

গৃহত্যাগ করিবার কথা অখিলেশের, করিল অমরেশ।

ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলাইয়া সেই যে সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না। খোঁজখবর যা হইল যৎসামান্য, আরতির ব্যাকুল অনুরোধে কালোগৌরাঙ্গ কিছুদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল, তা'ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ব্যস।

হারাইয়া যাইব বলিয়া যে পণ করিয়াছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর বৈ কি! পৃথিবীর এই বিশাল জনারণ্যে অগণ্য ছেঁড়া চটির ভিড়ে তাহার পদচিহ্ন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে বলিবে ?

শুধু খোকা মাঝে মাঝে অবুঝ প্রশ্ন করে—কাকা কবে আসবে মা ?

ছেলেকে বুকে চাপিয়া আরতি আপনাকেই সান্ত্বনা দেয় হয়তো—আসবে বাবা, কালপরশু দু'চারদিন পরে আসবে। এতবড় গাড়ী চড়ে, ভালো ভালো পোষাক পরে, এই এ-তো খেলনা নিয়ে এসে বলবে, 'খোকন কই, খোকন ?'

এসব সান্ত্বনা পুরাতন, হঠাৎ বীররসের অবতারণা করিয়া খোকন বলে—পিসীকে মেরে ফেলবো।

পিসী অবশ্য কৃষ্ণবালা, সহসা তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের স্পৃহা খোকনের মনে জাগিয়া উঠে কেন কে জানে, কিন্তু কাকার গৃহত্যাগের ব্যাপারে পিসীর কোথায় যেন হাত আছে এই ধারণা অতটুকু ছেলের ভিতরও বদ্ধমূল হইয়া গেল কেমন করিয়া সেইটুকু বলা কঠিন।

ভাবা গিয়াছিল ভ্রাতার গৃহত্যাগে অখিলেশের দায়িত্ববোধ কিছুটাও ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু দেখা গেল আরো নিস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে সে। আজকাল আহার-নিদ্রার ব্যাপারটাও এত সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে যে কদাচিৎ তাহার দর্শন মেলে।

আর লোকের মধ্যে তো পিসীমা, আরতি ও খোকন।

পিসীমা সে হতভাগার মুখ দেখিতে চান না, খোকনও তথৈবচ, শুধু আরতি।

আরতির কথা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

তবু সংসার চলিয়া যায়। কাহারও জন্য কিছুই আটকায় না। কালোগৌরাঙ্গ স্বেচ্ছায় এই হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকাখানার ভার লইয়াছে—তরতর করিয়া না চলুক, কাদায় ঠেক খাইতে খাইতেও চলে।

প্রবীরও অবশ্য প্রায়ই আসিয়া খোঁজখবর লয়, বিপদের সময় আরতি তাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। তবু সম-অবস্থাপন্ন গৌরাঙ্গের নিকট যত সহজে সাহায্য লওয়া চলে, প্রবীরের কাছে তেমন সহজে চলে না।

কিন্তু সম্প্রতি অবস্থা আসিয়াছে নূতন।

অখিলেশ যাহা উপার্জ্জন করিত—গুরুপ্রণামী বাদেও সংসার খরচটা আটকাইত না। এইটুকু কর্ত্তব্যবোধের সূক্ষ্মসূত্রে সংসারের সঙ্গে যোগ ছিল তাহার, কিন্তু সম্প্রতি নাকি সাধন ভজনের বিঘ্নস্বরূপ এই চাকরিটা সে ত্যাগ করিয়াছে।

ইহার পরে অপরের কাছে অর্থ সাহায্য লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

আটার ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়া গৌরাঙ্গ বলে—অখিলেশদার আপিসে খোঁজ নিয়েছিলাম পিসীমা, খবরটা সত্যিই বটে।

পিসীমা মুখখানা কালো করিয়া বলেন—সে আমি আগেই বুঝেছিলাম, এইবার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরোতে হবে আর কি! একজন বিবাগী হ'লেন, একজন বৈরাগী হ'লেন, এখন মর মাগী তুই!

গৌরাঙ্গ চড়াগলায় বলে—আমার যদি পয়সা থাকতো পিসীমা, তা'হলে অখিলেশদার চাকরি ছাড়ায় থোড়াই কেয়ার করতাম! খোকার আর বৌদির ভার—

—পয়সা থাকলেও তুমিই বা পরের বৌ-ছেলের ভার নিতে যাবে কেন, আর আমরাই বা নেবো কোন্ সুবাদে বাছা?—বলিয়া গৌরাঙ্গের প্রদীপ্ত উৎসাহে বরফজল ঢালিয়া দিয়া বিরস মুখে উঠিয়া যান কৃষ্ণবালা।

গভীর রাত্রে 'আসন' 'প্রাণায়াম' 'ধ্যানজপ' ইত্যাদির পালা সাঙ্গ করিয়া অখিলেশ কম্বল বিছাইয়া শয়নের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় ও-ঘর হইতে আরতি আসিয়া দুয়ার ভেজাইয়া কপাটে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

ইদানিং কাজকর্ম্মের সুবিধার ছুতায় কোণের দিকের এই ছোট ঘরখানি অখিলেশ বাছিয়া লইয়াছে। আরতি এ ঘরের ছায়াও মাড়ায় না। স্বামীর অনুপস্থিতির অবসরে ঝাড়ামোছা করিবারও সুবিধা নাই, তালা লাগাইয়া যায় অখিলেশ।

হঠাৎ অসময়ে আরতিকে দেখিয়া অখিলেশ বিস্ময়ের সঙ্গে একটু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। চাকরি ছাড়ার খবর যে আরতির কানে গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাজটা করিয়া পর্য্যন্ত খুব বেশী স্বস্তিবোধ ছিল না তাহার। কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন—'দাসত্ব

মোচন না হলে আত্মার উন্নতি হবে কোথা থেকে? ভেতর-বার দুই-ই স্বাধীন করতে হবে।'

অকারণে কম্বলের কল্পিত ধূলাগুলো হাত দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে অখিলেশ নিজের সপক্ষে নানা যুক্তি গুছাইতে থাকে।

মিনিট কয়েক মৌন থাকিয়া আরতি মৃদুস্বরে কহিল—এখন কি দু'একটা কথা শোনবার সময় হবে?

—বেশী কিছু?—অখিলেশও মৃদুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

—না, বেশী কিছু বলবার ধৈর্য্য আমার নেই। শুধু জানতে চাইছি খোকার ভার কি তুমি নিতে চাও?

—খোকার?

—হ্যাঁ খোকার।—দৃঢ়স্বরে উত্তর করে আরতি—পিসীমার যা সম্বল আছে একলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু খোকার জন্যে হয়তো বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের সম্বল খোয়াতে হবে। তাই জানতে চাইছি ওর ভার তুমি রাখতে চাও কি না।

—শুধু খোকা? আর তুমি?—মুখ ফস্‌কাইয়া বাহির হইয়া যায় অখিলেশের।

—আমি?—হঠাৎ হাসিয়া ওঠে আরতি, দীর্ঘদিন আগে গভীর রাত্রে স্বামীর আদরে-পরিহাসে যেমন করিয়া হাসিয়া উঠিত, যে অবাধ হাসির জন্য পিসীমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত অখিলেশ।

কতদিন যে হাসি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে আরতির!

হাসি থামাইয়া স্থির গলায় সে বলে—আমার জন্যে নাই বা ভাবলে? রূপ আর বয়স, মেয়েমানুষের ওজন হাল্কা করে দেয়, সকলের কাছে ভার লাগেনা। এইটুকুই শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম তোমায়।

অখিলেশ অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে। আরতির নির্ব্বাক সহিষ্ণু-মূর্ত্তিই দেখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, এমন রূঢ় তীক্ষ্ণভাষা সে শিখিল কখন?

কিন্তু আপনার ওজনও হাল্কা করিতে না দিয়া ধীর স্বরেই বলে অখিলেশ—তুমি কি আমায় অপমান করতে এলে?

—অপমান? না না, শুধু তোমার অনুমতি চাইতে এলাম—খোকাকেও কি আমার সঙ্গে দুর্গতির পথে টেনে নিয়ে যাবো?

—দুর্গতির পথটাই কি শেষ পর্য্যন্ত বেছে নিলে আরতি?

বহুকাল পরে স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনিয়া চকিতের জন্য কাঁপিয়া ওঠে আরতি, কিন্তু পরক্ষণেই সহজ গলায় উত্তর দেয়—অগত্যা। তবু তো গতি? তিলে তিলে পাঁকে পুঁতে যাওয়ার চেয়ে হয়তো ভালো। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো।

—কি, খোকা? ওকে ভগবান দেখবেন, ভার নেবার কর্ত্তা তুমি-আমি নয়, অহঙ্কার ত্যাগ করে এইটুকুই শুধু বিশ্বাস কোরো।

—তাই চেষ্টা করবো।

বলিয়া দুয়ার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়—অখিলেশকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া।

বাহির হইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া আসে নাই অখিলেশ, সরিয়া আসিয়াছে আরতিরই কাছে।

কাছাকাছি দাঁড়াইয়া বদ্ধগভীর দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকে। অভিমানে অন্ধ হইয়া সত্যই কি নরকের অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায় আরতি! সতই কি কোন অস্বাভাবিক পথ ধরিয়া বসিবে!

কিন্তু সন্ন্যাসী অখিলেশের তাহাতে কি ক্ষতি? আরতি তাহার কে? বাহিরের বন্ধন মাত্র। বরং সেই বন্ধন হইতে যদি সে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়া যায়, মন্দ কি? হয়তো এই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

—তুমি তা'হলে সত্যই থাকতে চাও না?

—না।

—গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছ?

—হ্যাঁ।

—হু। সেই নরকের সঙ্গীটি কে জানতে পারি কি?

—সে কথা বলতে বাধ্য নই আমি।

যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল আরতি, তেমনিই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। শুধু চলিয়া যাইবার সময় আধময়লা শাড়ীখানার পিঠের উপরকার প্রকাণ্ড সেলাইটা যেন নির্লজ্জ ব্যঙ্গ করিয়া গেল অখিলেশকে।

…আরতির জন্য শেষ কবে শাড়ী কিনিয়াছে অখিলেশ?…অমরেশ নিরুদ্দেশ হইয়াছে কতদিন?…এ সংসারের নিত্য প্রয়োজনের বাহানা মিটায় কে?

ভগবান?

সমরের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই! এ, আর, পি,র কাজ পাওয়া সহজ, 'ফ্রন্টে' যাওয়া অত সোজা নয়। কিন্তু বোমা পড়িলে মড়া বহিবার প্রবৃত্তি সমরের নাই, সে চায় রীতিমত যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রাণ, কোটি কোটি টাকা যেখানে মুহূর্তে ধ্বংস হইয়া যায়, জীবন আর মৃত্যুর যেখানে আলাদা কোন অর্থ নাই, তেমন জায়গায় যাইতে চায় সমর। তাই না-মঞ্জুর পত্রখানা ছিঁড়িয়া চট্‌কাইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারি করিয়া বেড়ায়, ঘর হইতে দালানে, দালান হইতে ঘরে।

মেনকা আসিয়া উঁকি মারিল উষার খোঁজে।

—উষা দি কোথায় সমর দা?

—বাড়ী নেই।

ছ্যাবলা মেনকাকে এর বেশী সম্মান কেহ করে না। কিন্তু মেনকা নিজেই চাপিয়া বসে—কোথায় গেছে?

—কে জানে, ননদের শ্যালার বাড়ী না কোন্ চুলোয়।

—ননদের শ্যালা? সে আবার কি জন্তু সমর দা?—বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে থাকে মেনকা।

—ওই রকম কি একটা বললে। তাসের আড্ডা আজ আর বসবে না, যাও।

—তাই যাই—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া টানা সুরে কয় মেনকা—ফাল্গুনে হাওয়ায় প্রাণটা কেমন হুহু করছিল, বাড়ী বসে থাকতে ভালো লাগল না, কোথায় বা যাই। তুমি না কি যুদ্ধে যাবে সমর দা?

—যমের বাড়ী যাবো।

—বাঃ বেশ জায়গা তো?—ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে মেনকা—শুনে লোভ হচ্ছে।

—লোভ হচ্ছে? বটে? রুক্ষদৃষ্টিতে এই নির্লজ্জ মেয়েটার পানে তাকাইয়া তীক্ষ্ণস্বরে সমর বলে—যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছে হচ্ছে? কিন্তু খবরদার টুঁশব্দ করলে টুঁটি টিপে ছিঁড়ে দেব।

—বা-রে! শুধু শুধু বকছো কেন?

—চুপ।

সহসা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই মেনকা কাঁদিয়া ওঠে—ও সমর দা, তোমার পায়ে পড়ি দোর খুলে দাও, লক্ষীটি, বড্ড ভয় করছে!

—খবরদার, বলেছি না টুঁ শব্দ করলে খুন করবো?

—সমর দা, তোমায় দু'টি পায়ে পড়ি! দোর খুলে দাও ভাই!

—কেন? যমের বাড়ী যাবার বড্ড যে সখ হচ্ছিল?

—মাপ করো সমর দা, ছেড়ে দাও আমায়।

—ধরলাম কোথায় যে ছেড়ে দেব? তোর মত মেয়েকে শয়তানেও ছোঁয়না, বুঝলি? যা—বেরো। রাবিশ! মাটির পুতুল! রাস্তার কুকুর!

দরজা খুলিয়া দিতেই কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে মেনকা—আমায় একটু বিষ এনে দাও সমর দা, সব দুঃখের শান্তি হোক! বড় কষ্ট আমার।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেনকার এই অসহায় পশুর মত আর্ত্ত ক্রন্দন দেখিতে দেখিতে একটু নরম সুরে প্রশ্ন করে সমর—শ্বশুরবাড়ী যাবি মেনকা?

—ওরা আমায় নেবে না সমর দা!

—কেন? কি করেছিস তুই?

—কিছু করিনি, এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—আমি কালো-কুচ্ছিৎ, বোকা তাই।

—আচ্ছা, নেয়-কি না দেখে নেবো। বিশ্বাস করে যেতে পারবি আমার সঙ্গে?

—তুমি নিয়ে যাবে!

অবাক হইয়া তাকায় মেনকা।

—হ্যাঁ যাবো। কিন্তু এই একবস্ত্রে এখুনি। উত্তরপাড়ায় তোর শ্বশুরবাড়ী না? বাড়ী চিনতে পারবি?

—কিন্তু লোকে কি বলবে সমর দা?

—লোকে? লোকে যদি বলে—'আমি তোকে নিয়ে পালিয়েছি', সে অপবাদে স্বর্গে যাবি বুঝলি?…দাঁড়া, হাণ্টারটা নিয়ে আসি, সঙ্গে থাকা ভালো।

—চাবুক নিয়ে—ওঁকে মারবে না কি?—আর একপালা কাঁদিবার যোগাড় করে মেনকা।

—প্যান প্যান করিসনে মেনি, দরকার হলে মারতে হবে বৈ কি! পাগলা কুকুর রাস্তায় ছেড়ে রাখলে কুকুরের মালিকের ফাইন হয়, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে রাস্কেলকে।

॥ সাত ॥

খুলনা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম হইতে চিঠি লিখিয়াছে মন্দিরা।—'দাদাভাই, কেমন আছি আর কেমন লাগছে জানতে চেয়েছ? যদি রাগ না করো বলি—খুব খারাপ লাগছে না। এখানের যিনি মা, দেখলে দয়া হয় বেচারাকে। রোগা ছোট্ট এতটুকু মানুষ, আর অগাধ ছেলে মেয়ে। তাদের বায়না আর বাড়ীর কর্ত্তার শাসন এই দুটো জিনিস দু'দিক থেকে অহরহ পিষছে বেচারাকে। আমার মত একটি কাজের মেয়েকে পেয়ে—(হাসছ যে? কাজের নই ভাবছ? দেখো এসে—সেই এক ডজন শিশুর পালকে কি রকম সায়েস্তা করে রেখেছি) হাতে চাঁদ পেয়েছেন প্রায়।

সত্যি এতদিন এই দুঃখের সংসার থেকে ছিটকে গিয়ে আমি একলা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছি মনে করে লজ্জা হচ্ছে। তাই অহরহ ভুলতে চেষ্টা করছি, আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রধানা ছাত্রী, সকল গুণের আধার, সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া, বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণা, চিত্রবিদ্যায় অনুরাগিনী, আর দাদা ভাইয়ের আদরিণী শ্রীমতী মন্দিরা দেবী।

মনে রাখছি, আমি হচ্ছি—মঞ্জু, অঞ্জু, বেলা, বাসু, লাট্টু, নাট্টু, হাসু, সোনার পূজনীয়া দিদি। গ্রাম্য হাইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা, সৎপাত্রের অভাবে এতদিন পাত্রস্থ হতে পারিনি।

এর জন্যে পাড়াসুদ্ধ সকলে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। শোনা যাচ্ছে, 'পল্লী-মঙ্গল সমিতি' থেকে চেষ্টা চলেছে আমার হিল্লে করতে।

সব তো শুনলে? শুধু দোহাই তোমার, একটি অনুরোধ—'হাত খরচের' ছুতো করে অনর্থক কতকগুলো অর্থ নষ্ট করতে পাঠিও না তুমি। দরিদ্রের ঘরে লোভের সৃষ্টি করো না। আমি যা, তাই থাকতে দাও আমায়।

অমরেশ বাবু ফিরে এসেছেন কি?

—তোমাদের মন্দিরা।'

মন্দিরা চলিয়া গিয়াছে, বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া অতীন মুখুজ্যে পৃথক্ হইয়াছেন। উঠানের মাঝখানে 'ব্যাফল্ ওয়ালের' মত প্রকাণ্ড এক পার্টিশন উঠিয়াছে।

জ্যোতির্ময়ী ব্রত নিয়ম দানধ্যানের এলোমেলো পথ ছাড়িয়া গুরুমন্ত্র লইয়াছেন, আর পাত্রী খুঁজিতেছেন প্রবীরের জন্য।

বিজয় মল্লিকের আর্ত্তত্রাণ সমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, ত্রাণকর্ত্তারা সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে, 'আর্ত্ত' খুঁজিয়া পাওয়াও দুষ্কর।

নিজের বৈঠকখানায় একটি নাইট্-ইস্কুল খুলিয়াছে বিজয়, পাড়ার বস্তির ছেলেদের 'কাঠি-বরফ' ও 'শোন্ পাপড়ির' লোভ দেখাইয়া পড়াইতে হয়।

সেখানেই মাঝে মাঝে ঢুঁ-মারিতে যায় প্রবীর।

এমনি একদিন পড়ানোর মাঝখানে শ্রীপতি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া খবর দিল—অমরেশ বাবুর বাড়ী থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে দাদাবাবু!

—ডাকতে এসেছে? কে রে?

—সেই বজ্জাত বুড়িটা।

—কেন বল দেখি?

—বলছে—বলছে যে ওদের বাড়ীর সেই ছোট্ট ছেলেটা না কি মারা গেছে।

—মারা গেছে!

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন স্তব্ধ হইয়া যায় একটি কথার আঘাতে।

বিজয় মল্লিক যখন অনেক খোঁজাখুঁজির পর অখিলেশকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ঢুকিল, তখনো পিসীমা পাড়ার মেয়েদের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উন্মাদ ভঙ্গীতে চীৎকার করিতেছেন—ওরে আমার সোনার যাদু, একফোঁটা ওষুধ তোমার পেটে পড়ল না মানিক! রাক্ষুসী ডাকাত মা, সামনে বসে থেকে তোমায় হত্যে হতে দিলে বাবা! হে বাবা নকুলেশ্বর, কি অপরাধ হ'ল বাবা!

ঘরের ভিতর পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে আরতি।

ঘটনা অত্যন্ত মামুলি—গতরাত্রি হইতে ভেদবমি সুরু হইয়াছিল, আজ সন্ধ্যায় সেটা বড় হইয়া গিয়াছে। নূতনের মধ্যে এই—সকাল বেলা অখিলেশ গুরুর চরণামৃত দিবার উপদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই। আর পিসীমা গিয়াছিলেন কালীঘাটে, মায়ের হাতের 'খাঁড়া ধোওয়া' জল আনিতে। এই মাত্র ফিরিয়াছেন।

সারাদিন আরতি কাহাকেও খবর দেয় নাই, ডাকে নাই—ঘুমন্ত ছেলেকে আগলাইয়া থাকার মত নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

পিসীমা আসিয়া দেখেন এই কাণ্ড।

সন্ন্যাসী অখিলেশের 'মায়াবাদ' ঘুচিয়া গেল না কি?. সিঁড়িতে উঠিতে পা কাঁপিতেছে কেন? সারা রাস্তা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে কেন সে।

কিন্তু দুয়ারের নিকট আসিতেই পাথরের পুতুল উন্মাদিনীর মতো বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

—না, ভেতরে যেতে পাবে না তুমি, কিছুতেই না।

—দেখতে দেবে না খোকাকে?

—না না না! কি দেখতে চাও? নিজের কীর্ত্তি? সাধু তুমি—তোমার হুকুম ভগবান শুনবেন না? শুনেছেন বৈ কি? খোকার ভার নিজেই নিয়েছেন। আর কেন? যাও যাও—

মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায় অখিলেশ।

এইমাত্র গুরু উপদেশ দিতেছিলেন—স্ত্রী, পুত্র কেউ কারো নয় রে ব্যাটা, জন্মমৃত্যু সব সমান—

গুরু উপদেশের ভিত আলগা হইয়া আসিতেছে কেন?

নিজের ঘরের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া পরের সংসারের তামাসা দেখিবার সময় কার আর কতক্ষণ থাকে? রাত্রিও হইতে থাকে। সমর, বিজয়, প্রবীর আর গৌরাঙ্গ চারজনে মৃতদেহটার সদগতির উদ্দেশে বাহির হইয়া যাইতেই যে-যার আপন আপন ঘরে ফিরিলেন।...রাত্রি হইলেও কৃষ্ণবালা বাহির হইলেন গঙ্গাস্নানের চেষ্টায়। তাঁহার গুরু মন্ত্রের শরীর, সারারাত তো আর অশুচি হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

মেনকার মা কৃষ্ণবালাকে পথে বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহার পিছু লইতে লইতে ছোট জাকে ডাকিয়া বলেন—ঝোলটা চাপানো থাকলো ছোট বৌ দেখো, আমি একবার যাই ঠাকুরঝির সঙ্গে।

ছোট বৌ শঙ্কিত ভাবে বলে—এই রাত্তিরে?

—তা রাত বলে আর করছি কি! মানুষের বিপদ-আপদে কি তার দিনক্ষণ দেখলে চলে?...কি জানি—গঙ্গা জায়গা, শোকে তাপে মানুষটা যদি আপ্তঘাতী হয়?...ভালো কথা, গঙ্গা জলের বড়ো ঘটিটা দাওতো বার করে—অমনি জল আসুক একঘটি, এক ফোঁটা গঙ্গা জল নেই ঘরে।

আরতির জন্য মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। একে তো সদ্যমৃত সন্তানের জননীর মুখ দেখাই অকল্যাণকর, তাহার উপর আবার যে মেয়েমানুষ একমাত্র সন্তানকে যমের হাতে ধরিয়া দিয়া নির্জ্জলা চক্ষে বসিয়া থাকে তাহার মুখ দেখা!

সে যে মহাপাতক!

কোটি জন্মের নরকবাস নির্দ্দিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়।

অখিলেশ কোথায় গেল কে জানে! হয়তো বা পরম সান্ত্বনার আশায় আবার ফিরিয়া গিয়াছে সাধের গুরু আশ্রমে। কৃষ্ণবালা গঙ্গাস্নানের ফেরৎ পূজার ঘরে ঢুকিবার আগে অখিলেশের আশায় সদর দরজাটার খিল বন্ধ করার বদলে সুধু কপাট ভেজাইয়া দিয়া, দালানের একধারে স্তিমিত শিখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটা বসাইয়া রাখিয়া উঠিয়া যান উপরে।

সারাদিনে পরিশ্রমও তো কম হয় নাই তাঁহার। কালীঘাট, গঙ্গারঘাট, নকুলেশ্বর তলা, ছুটোছুটি কাণ্ড! আহ্নিক পূজার শেষে ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসা দুইখানা গালে দিয়া একঘটি জলপানান্তে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেও সত্যি দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে।

ঝড়ের ঝাপটে ভারী কপাট দুইখানা থাকিয়া থাকিয়া 'ঝনাৎ ঝনাৎ' শব্দে আছাড় খাইতে থাকে···সে শব্দ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার কানে যায় না, যে জাগিয়া আছে তাহাকে যেন থাকিয়া থাকিয়া আছাড় মারে।

··· ··· ···

অনেক রাত্রে কে একজন উঠানে আসিয়া ধীরে ধীরে—"পিসীমা পিসীমা" বলিয়া ডাকে, কিন্তু কে কোথায়? কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর সে বেচারা নিতান্ত নিরুপায়ের ভঙ্গীতে লণ্ঠনের শিখাটা সতেজ করিয়া দিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যায় উপরে।···বিপদ মন্দ নয়! সমর আর বিজয় তো দিব্য কাটিয়া পড়িল পথ হইতে, গৌরাঙ্গ শশ্মান ঘাটে একবার বমি করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ঢুকিয়াছে, আর এই রাত্রি একটার সময় এই ভয়াবহ প্রেত পুরীতে আসিবার ভার পড়িল প্রবীরের ঘাড়ে।···

কিন্তু প্রবীরই বা আসিল কেন?

না আসিলে কে বা তাহাকে ফাঁসি দিত?

খোকনের গলার সুতার মতো সরু সোনার হারটুকু একরাত্রি প্রবীরের পকেটে পড়িয়া থাকিলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। তবে? গোপন অন্তরের গভীর তলায় নিজেরই কি একবার আগ্রহ জাগে নাই প্রবীরের? সেই পাষাণ প্রতিমাকে আর একবার দেখিবার আগ্রহ?

তেমনি করিয়াই বসিয়া আছে, না আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়া মায়া মমতাহীন রুক্ষ নিষ্ঠুর পৃথিবীর মাটিতেও চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছে? কে দেখিবে তাহাকে?···

অখিলেশ?

কৃষ্ণবালা?

··· ··· ···

উপরের দালানে আসিয়া আর একবার মৃদু ভীরু কণ্ঠে—'পিসীমা' বলিয়া ডাকিতেই আরতি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্ন করিল না—'কে'? শুধু চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। যেন চোর ডাকাত হইলেও ক্ষতি নাই তার। যেন ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আর কিছুই নাই পৃথিবীতে।

—পিসীমা কোথায় ?—মৃদু কণ্ঠ শোনা যায় প্রবীরের।

—কি জানি। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মানুষের কণ্ঠস্বরে যেন রাত্রির গভীরতা কিছুটা হালকা হইয়া আসে, নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজে বয়।

—খোকার গলার এই হারটা—

কুণ্ঠিত অপরাধীর ভঙ্গীতে হার সমেত হাতটা বাড়াইয়া দিতেই, চিরশান্ত সুস্থির মানুষটা হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বসে।…সোনার হার সমেত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে—প্রবীর ঠাকুরপো! আপনি! আপনি আমাকে একটু দয়া করতে পারেন ?…আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন ?

সংস্কারের বশেই হাতখানা খসিয়া পড়ে হাতের উপর হইতে, মুহূর্ত্তের সুযোগকে দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিবার সাহস সহসা হয় না।

—কোথায় যেতে চান, বলুন ?

—যেখানে হোক !…শুধু এ বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে।

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া প্রবীর আর একবার প্রশ্ন করে—কিন্তু একটা কোথাও ঠিক না করে—দেশে-বিদেশে যেখানেই আপনার কোনো আত্মীয় থাকুন, পৌঁছে দেবো আমি কথা দিচ্ছি।

—বিদেশে ? জামালপুরে পৌঁছে দিতে পারবেন ?

—নিশ্চয়ই। এ বাড়ীতে—এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে রেখে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাও সহজ নয়।…অখিলেশদা ফেরেন নি তো ?

—না।

দালানের আলোর উজ্জ্বল শিখা, অথবা মনুষ্যকণ্ঠের মৃদু রেশ—কারণটা যাই হোক—কৃষ্ণবালার এতক্ষণে ঘুম ভাঙে——'অখিল এলি বাবা ?' বলিয়া আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়াই যেন বিদ্যুতাহতের মতো আড়ষ্ট হইয়া যান। সম্বিত পাইয়া যখন ফিরিয়া যান, মনে হয় লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গেলেই যেন বাঁচেন তিনি।

—আ আমার কপাল! তাই বলি—অখিল আমার এই বয়সে—

শ্লেষ, বেদনা, হতাশা, ধিক্কার অনেক কিছুর সংমিশ্রিত তীক্ষ্ণ এই মন্তব্যটুকু শোনা যায় কৃষ্ণবালার ঘরের ভিতর হইতে।

সেই ঘরের দিকে একমিনিট তাকাইয়া থাকিয়া প্রবীর দৃঢ় স্বরে বলে—আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন বৌদি, কালই নিয়ে যাবো।

॥ আট ॥

ট্রেন জামালপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেই প্রবীর বাঙ্কের উপর হইতে আপনার ভারী সুটকেশটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল—বৌদি এসে গেল।

আরতি উঠিয়া বসিয়া এতক্ষণে প্রথম কথা কহিল—তুমি কোথায় যাবে ঠাকুরপো?

—এই তো আপনার সঙ্গেই এলাম।

—আমায় পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে?

—তবে? কেন বলুন তো?

—এত বড় সুটকেশ সঙ্গে নিয়েছ দেখে ভাবছি বুঝি আরো অনেক দূরে যাবে।

—এতে আপনার কাজে লাগবার মত কতকগুলো মাল আছে, সত্যি তো আর একবস্ত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী ওঠা চলে না? অবশ্য জামা-টামাগুলো মাপে ঠিক হবে কি না জানি না, আন্দাজি নেওয়া।

আরতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রবীরের চোখের উপর চোখ রাখিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—তুমি সব কিনেছ?

আসল প্রশ্নটা এড়াইয়া প্রবীর খোলা কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে তাড়াতাড়ি কহিল—কেন রাগ করলেন না কি?

—রাগ? না রাগ করিনি, এখনো আমার জন্যে কেউ ভাবে দেখে আশ্চর্য্য লাগছে।

—ভাববে না কি রকম? কি মুস্কিল! নিন উঠুন, বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে পারবেন তো? ষ্টেশন থেকে খুব দূর না কি?

—কি জানি, এখানের কোনো ঠিকানাই তো আমি জানি না ঠাকুরপো।

—বলেন কি!

উদ্‌ভ্রান্ত আরতি যখন এই জায়গাটার নাম করিয়াছিল তখন প্রবীরের ধারণা জন্মিয়াছিল খুব সম্ভব আরতির পিত্রালয় এখানে।

কিন্তু এখন এ বলে কি!

—তা'হলে হঠাৎ এখানে আসতে চাইলেন যে?

—কি জানি ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম—খুব ভালো লেগেছিল জায়গাটা, তাই হয়তো—

ছেলেবেলায় কাদের বাড়ী এসেছিলেন তা'হলে?

—মামীর বাপের বাড়ী এসেছিলাম মামীমার সঙ্গে, কিন্তু তারা তো আর নেই।

ট্রেন প্লাটফরমে আসিয়া পৌঁছাইয়া গেল, এখন আর নামিবার তাড়াহুড়া নাই, তাছাড়া এটা গাড়ীর বিশ্রামস্থল, কাজেই খুব ব্যস্ত হইবারই বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রবীর প্রশ্ন করিল—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? কেউ নেই সেখানে?

—না।

অসহায় নারীর ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি বলিষ্ঠ পুরুষচিত্তকেও সহজে আর্দ্র করিয়া তোলে, সকরুণ মমতায় সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আসে।

এই বাষ্পভারাবনত দীর্ঘ আঁখিপল্লব, এই কম্পিত অধর, এই করুণ কোমল মুখশ্রী, কোন দিন কি সন্ন্যাসী অখিলেশের চোখে পড়ে নাই? মুহূর্ত্তের জন্যও কি ব্রত ভঙ্গ করিয়া এই ক্ষীণ সুকুমার তনুখানি সবল বাহুবেষ্টনে চাপিয়া ধরিতে সাধ জাগে নাই?

পুঁথির অন্তরালে স্নেহমমতা প্রীতিপ্রেম সমস্ত বিসর্জ্জন দিল কেমন করিয়া? যে লোক দয়াময়ের ভজনা করে, মানুষকে অবহেলা কি তাহার গায়ে লাগে না?

—আচ্ছা জামালপুর ছেড়ে দিন, ভালো করে ভেবে বলুন তো আর কোথায় যেতে চান—অর্থাৎ যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করবে এমন কেউ আছে কি না।—কোমল সুরে প্রশ্ন করে প্রবীর।

ঈষৎ হাসির ছাপ কম্পিত ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া ওঠে আরতির—স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা মেয়েকে কেউ আদর করে নেয় না ভাই, নিজের বাপ-মাও না। তাড়িয়ে দিতে যদি নিতান্ত না পারে, লাঞ্ছনার সঙ্গে নেয়।

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আরতির নত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর স্বরে প্রবীর কহিল—কিন্তু যদি কেউ আদরের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিতে চায়—তা'কে সে অধিকার দিতে পার না কি আরতি? নাম ধরলাম বলে রাগ কোরো না, অসহায় দেখে অপমান করছি মনে করে ভুল বুঝোনা—বড্ড ছোট, ভারী ছেলেমানুষ মনে হয় তোমাকে, তাই নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছা করে।

আরতি কথার উত্তর দিবে কি, এই স্নেহ-সহানুভূতির স্পর্শে তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের রুদ্ধ-বেদনা দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়া দেয়।

চাহিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেয় প্রবীর। অবস্থাটা বড় কষ্টকর।

সস্নেহে সান্ত্বনা দিবার অধিকার নাই, অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি কাছে টানিয়া মুছাইয়া দিবার উপায় নাই, দিবার কথা ভাবিতেও নাই। নিরুপায় ক্ষোভে শুধু বসিয়া বসিয়া দেখা।

চোখের জলকে অনেকক্ষণ ঝরিতে দিয়া কিছু পরে আরতি নিজেই বলে—না রাগ করবো না—কিন্তু সাহস কি তোমার সত্যিই হয়? এতবড় বোঝা বইতে পারবে? এক-দিনের দয়ামায়া নয়—চিরকাল—চিরদিন?

—বিশ্বাস করে দিয়েই দেখ আরতি! আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা করব না—এ শুধু একদিনের দয়ামায়া নয়, যখন তোমার সঙ্গে না ছিল পরিচয়, না ছিল চোখের দেখা, তখন থেকে প্রতিনিয়ত তোমার বঞ্চিত জীবনের গ্লানি আমাকে পীড়া দিয়াছে, তোমার ক্ষোভের বেদনা অহরহ করেছে আকর্ষণ। অমরেশ যখন পালালো তখন—

কি ইচ্ছে হয়েছিল জানো আরতি? ইচ্ছে হয়েছিল—সেই নিষ্ঠুর দৈত্যপুরীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি তোমাকে। নিজের মনকে সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারতাম না বলেই এড়িয়ে যেতাম তোমার সঙ্গ। আজ দৈব বা দুর্দৈব যাই বল—দুজনকে সংসারের গণ্ডির বাইরে এত কাছাকাছি এনে ফেলেছে বলেই হয়তো এতো বড় অসম্ভব কথা শোনাবার দুঃসাহস হ'ল। তাই বলছি—তোমার সব ভার বইবার সৌভাগ্য আমাকে দাও আরতি!

আপনার উত্তপ্ত মুষ্টির ভিতর আরতির হিমশীতল কম্পিত আঙুল কয়টি চাপিয়া ধরে প্রবীর।

আরতি হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করে না, তেমনি ভাবে বসিয়া সরল দুই চোখ প্রবীরের মুখপানে তুলিয়া ধরে। বাষ্পলেশহীন স্থিরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে—আমারও আজ স্বীকার করতে বাধা নেই—স্বামী যখন নিজের দায় এড়িয়ে, গেলেন মুক্তির পথ খুঁজতে, ধিক্কারে অভিমানে নিজেকে নষ্ট করবার এক দুর্দান্ত সখ জেগেছিল। ভেবেছিলাম—ওকে দেখিয়ে দেব অবহেলায় ফেলে রাখলেই সব জিনিস পড়ে থাকে না। মানুষ তো জড় নয়—তার রক্তমাংসের শরীরের সমস্ত প্রয়োজনকে চোখ বুজে অস্বীকার করে গেলেও অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অহঙ্কার করে বলেছিলাম—ভার যদি কাউকে দিতেই হয় তার দাম দেব, হাত পেতে ভিক্ষার ভাত খাবো না। কিন্তু খোকা সে সাহস নষ্ট করে দিয়ে গেছে। দেখলাম প্রতিশোধ নেওয়াও সহজ নয়। তারও বড় বেশী দাম দিতে হয়।

—কিন্তু এতো প্রতিশোধ নেওয়া নয় আরতি? এ শুধু বাঁচবার চেষ্টা। একজনের খেয়ালের খেলায় আর একজনের জীবন মিথ্যে হয়ে যাবে এর কোনো অর্থ হয়? এত বড় জীবনটা তোমার কাটবে কি নিয়ে বলতে পারো?

—বিধবারও তো দিন কাটে প্রবীর?

—না, কাটে না। সংসার-সমাজের শাসন, আর লোকনিন্দার ষেড়া-আগুনের ভয় তাকে কাটাতে বাধ্য করে। নইলে কাটত না।

—আচ্ছা আমার কথা থাক, তোমারও তো সমাজ, সংসার, লোকনিন্দের ভয়, সবই আছে?

—আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছো কেন, আরো একটা জিনিস আমার ভগবানের দয়ায় প্রচুর আছে, যা সকলের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে। আমার কথা ভেবো না, শুধু তোমার নিজের কথা বল—জীবনটাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা কি অসম্ভব চেষ্টা?

—বুঝতে পারছি না প্রবীর—আগে ভাবতাম—পথে বেরোতে পারলেই বুঝি অনেক পথ খোলা পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে পথ? কোন পথে সত্যিকার মঙ্গল? নিজের ভুলে অপরকে দুর্গতির পথে টেনে নিয়ে যাবো কোন ধর্মে? একটা সামান্য মেয়েমানুষের দায় যে এত বড়, আগে সে খেয়াল ছিল না। তার চাইতে হয়তো ফিরে যাওয়াই ভালো।

—কোথায় ফিরবে ?

—যেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

—কখনো না, কিছুতেই না—তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া ওঠে প্রবীর—ভিখিরীর দরজায় হাত পাতার অপমান থেকে তোমায় বাঁচাবো আমি।

॥ নয় ॥

আনন্দময় যে চাল চালিতে জিদ করিয়া মন্দিরাকে আনিলেন, সে চাল ব্যর্থ হইল মন্দিরার জিদে। জ্যোতির্ম্ময়ী প্রদত্ত অর্থের কানাকড়িও আনন্দময়ের ক্যাশবাক্সে উঠিল না।

মন্দিরার কাছে আনন্দময়কে হার মানিতে হইল। বার বার—'লইতে অনিচ্ছুক' ছাপ মারিয়া প্রেরিত অর্থ আবার দাতার ভাঁড়ারেই ফিরিয়া গেল।

দরিদ্রের ঘরে দরিদ্রের মত থাকিতে চায় মন্দিরা।

এখন এই ধাড়ি আইবুড় মেয়ে লইয়া আনন্দময় করেন কি? মুস্কিল এই—ধমক দিয়া 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিবার সাহসও হয় না। নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে আনন্দময়ের।

কিন্তু মেয়ের কাছে হারিয়া যাওয়ার লজ্জা মেয়েকে জব্দ করিবার ফিকির খুঁজিয়া বেড়ায়। এবং ইহারই সহজ উপায় হইতেছে—কন্যাকে অনভিপ্রেত এবং অরুচিকর বিবাহে বাধ্য করা।

মন্দিরাও ভাবিয়া আশ্চর্য্য হয়, সকলের সঙ্গেই বেশ মানাইয়া চলা যায়—মাকে, ভাইবোনগুলিকে তো বেশ ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে, কিন্তু শুধু পিতার উপরই বা এমন বিজাতীয় বিদ্বেষ আসে কেন তাহার ?

পিতা ও কন্যার অন্তরে অন্তরে এই এক রেষারেষির লড়াই চলে।

আজও সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই আনন্দময় বাসুকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—নবাবকন্যাটি গেলেন কোথা ?

'নবাব কন্যাটি'র অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও—শুনিয়া শুনিয়া বাসুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তাই সহজেই প্রশ্নের উত্তর দিল—দিদি সেই রাত্তির থেকে পড়া করছে। জানো বাবা, দিদি নাকি শান্তিকাকার চাইতে অনেক অনেক বেশী পড়া জানে ?

—তবে আর কি চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আমার! একে কেরোসিনের এই দুরবস্থা, আর রাত্তির থেকে পড়া হচ্ছে ? যার যা খুসী তাই করছে যে দেখি।

বলাবাহুল্য মন্দিরার কর্ণগোচর করাইবার উদ্দেশ্যেই কথাগুলি উচ্চারিত হইল। এবং

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার পক্ষে কোন বাধাও ছিল না। কিন্তু গায়ে পড়িয়া কথা বাড়াইবার বা মতামত ব্যক্ত করিবার মেয়ে মন্দিরা নয়।

যদিও সকালের আলো ফুটিয়াছিল, তথাপি কেরোসিনের শিখাটা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মন্দিরা "নবাব কন্যা" কথাটা লক্ষ্য করিয়া হাস্নুকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলে—বাবার নবাব হবার সখটি ষোলো আনা, না রে হাস্নু? লোকে না মানুক নিজেই বলে বলে যতটা পারেন—কি বলিস?

মেয়েকে সমীহ অমিয়াও করে না তা নয়, তবু মেয়ে আসায় ছোট ছেলে মেয়েগুলির দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইয়া সে যেন বাঁচিয়াছে। স্বামীর আচার-আচরণ অবশ্য কখনোই সে ভাল চক্ষে দেখে না, জ্যোতির্ময়ীর কাছ হইতে অর্থসাহায্য লইতে আপত্তি করার পর হইতে মেয়ের উপর আনন্দময়ের ব্যবহারটাও তার নিতান্তই দৃষ্টিকটু ঠেকে, তবু সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে না। কিন্তু আজ যখন আনন্দময় বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গায়ের ফতুয়াটা খুলিতে খুলিতেই উচ্চ চীৎকারে কহিলেন—সম্বন্ধটা পাকা করে এলাম বুঝলে?—তখন প্রতিবাদ না করা অসম্ভব হইল বেচারার পক্ষে।

ঈষৎ জোর গলায় কহিল—পাকা করে এলে মানে? সে আবার কি?

—অবাক হয়ে গেলে যে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

—দিতে হবে বলে যা তা দিতে হবে? তাছাড়া ওর বিয়ের জন্যে আমাদের এত ভাবনা কেন? নতুন দিদিমা—

আনন্দময় বিকৃত মুখে কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার নতুন দিদিমা তো সবই করলেন! কুড়ি বছরের মেয়ে পুষে ধাড়ি করলেন, অথচ বিয়ের নাম গন্ধ নেই। ওসব বড়মানুষের ধার আমি ধারি না। আমার মেয়ে, আমি যেখানে খুসী— যার সঙ্গে খুসী বিয়ে দেব, ব্যস। এর ওপর আর কথা নেই।

জজসাহেবের শেষ রায় দিবার ভঙ্গীতে শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া কর্তাজনোচিত ভাবে তেলের বাটি লইয়া জলচৌকীতে বসিলেন আনন্দময়।

অমিয়া বোধকরি মরিয়া হইয়া আরো কিছু বলিতে যাইতেছিল, মন্দিরা পিছন হইতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—ও মা, বেশী পাকা কথা কইতে বারণ করো বাপু, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আইনকানুন অতশত জানেন না তো, জোর করে বিয়ে দেবার অনেক ফ্যাসাদ আছে কি না! শেষটায় মুস্কিলে না পড়েন।

—বাঃ চমৎকার—বাপকে আইন দেখানো! কলকাতার শিক্ষা বটে!—বলিয়া আনন্দময় ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মাতা কন্যা উভয়কে বিদ্ধ করিয়া হন হন করিয়া পাতকুয়ার ধারে প্রস্থান করিলেন।

নাঃ, মেয়েকে তিনি দেখিয়া লইবেন।

জবরদস্তি করিয়া বিবাহ দেওয়ার কল্পনাটা এমনই হাস্যকর ছেলেমানুষি লাগে যে, সেটা লইয়া বেশী মাথা ঘামায় না মন্দিরা।

মাথা ঘামায় অমরেশের চিন্তায়।...

কেন গেল! কোথায় গেল! এসব ভাবনা পুরনো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ সত্য সত্যই হারাইয়া গেল, এই চিন্তাটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। এটাই নূতন হইয়া উঠে।

প্রথম প্রথম ভাবতে চেষ্টা করিত, দূর হোক ছাই—যাহারা তাহার পরমাত্মীয় তাহারাই যখন মনকে মানাইয়া লইতে পারিল, মন্দিরার এত মাথাব্যথা কিসের?

চেষ্টা করিলে কি হয়, মাথা আপন হিসাবেই ব্যথাগ্রস্থ থাকিয়া যায়। অবশেষে মন্দিরা চিন্তার অন্য ধারা বাছিয়া লয়।...আচ্ছা, একথাও তো ভাবিবার মত, অহরহ অমরেশের চিন্তাই বা তাহার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কেন? এত পরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত, স্বল্প পরিচিত লোকের মাঝখানে অমরেশই বা এমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল কোন অধিকারে? ইহাকেই প্রেম বলে না তো? কিন্তু যখন অমরেশ হারাইয়া গিয়াছিল, তখন তো এতো অধৈর্য্যভাব আসে নাই। যতীন মুখুজ্যের সদ্য মৃত্যুর আঘাতটা বোধহয় তখন অন্য অনুভূতির তীব্রতা কমাইয়া আনিয়াছিল।...তারপরই তো এখানে চলিয়া আসা! কি জানি বিরহের আগুনের আলোতেই বুঝি মনের ভিতরটা এতো স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

প্রেমের লক্ষণ বিচার করিয়া অবশেষে সন্দেহের আর কিছু থাকে না, এবং বেহায়া মেয়েটা একদিন জোর কলমে লিখিয়া বসে—'দাদাভাই গো, তোমার নিরুদ্দেশ বন্ধুর উদ্দেশ করছনা কেন? দেখছো না তার জন্যে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি?"

দুইবার রিডাইরেক্ট হইয়া সে চিঠি এলাহাবাদে প্রবীরের হাতে পৌঁছিয়া উত্তর আসিতে দেরী হইল অনেক। উৎসাহী আনন্দময় ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা রীতিমত ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু প্রবীরই বা করিবে কি, সে তো আর অমরেশকে ধরিয়া আনিয়া মন্দিরার আঁচলে বাঁধিয়া দিবে না? আপনার জীবনের নূতন সমস্যা লইয়া তখন সে ব্যস্ত।

শুধু লেখার ভিতর ব্যক্ত করিয়াছে তার বলিষ্ঠ হৃদয়ের স্পষ্ট মতামত। লিখিয়াছে—"মন্দিরা, আমার বন্ধুর ভাবনায় তুই মরতে বসেছিস, এটা সত্যি আমায় অবাক্ করে দিয়েছে। এটা আবিষ্কার করলি কখন? 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' প্রবাদটা মিলে যাচ্ছে যে। কিন্তু মরতে যদি সত্যি বসে থাকিস—বসে বসে মৃত্যুর দিন গুনিস নি। শুধু মনে রাখিস বাঁচতে হলে বাঁচবার চেষ্টা চাই। তোর জীবনের জটিল সমস্যার জট তোকেই খুলতে হবে। এটুকু চেষ্টার জন্যে যে ধৈর্য্য যে বল থাকা আবশ্যক তা যদি নাই থাকে—মরা আর বাঁচার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। হয়তো কাছে থাকলে তোর কিছু সাহায্য করতে পারতাম—কিন্তু আমার জীবনের সমস্যা আরো অনেক বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। তার সত্যিকার সমাধান যে দিন সহজ হয়ে দেখা দেবে, সেই দিন ফিরব তোদের কাছে, তার আগে নয়।"

কলিকাতায় থাকিলে হয়তো অমরেশের সন্ধান করা অসম্ভব হইত না, কিন্তু অমরেশের

উপর অভিমানে, জ্যোতির্ম্ময়ীর উপর অভিমানে যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরেই অভিমান করিয়া মন্দিরা এই অপরিচিত পিতৃগৃহে আপনাকে নির্ব্বাসন দিয়াছে।

কিন্তু জীবনটা কি মিথ্যা অভিমানে নষ্ট করিয়া ফেলার মত তুচ্ছ বস্তু? অমরেশকে যদি সত্যই তাহার প্রয়োজন থাকে, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কি বাহির করিতে হইবে না তাহাকে?

আপনার নিভৃত হৃদয়ের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রয়োজনের ওজন অনুমান করিবার চেষ্টা করে মন্দিরা।

বিনিদ্র রাত্রির অনেকটা অংশ কাটিয়া যায় সম্ভব অসম্ভব কত কিছুর কল্পনায়।

কখনো সেকালের রাজকন্যার মত 'ময়ূরপঙ্খী নায়ে' চড়িয়া বাহির হয় নিরুদ্দেশ রাজপুত্রের উদ্দেশে—বাহির হয় পুরুষের সাজে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া তেপান্তরের মাঠে। কখনো এ-কালের লর্ড দুহিতার মত নিজস্ব 'প্লেনে' চড়িয়া আকাশের গায়ে, অথবা টু-সিটার খানায় চাপিয়া অজানা শহরের পীচঢালা রাস্তায়।

হয়তো কাছে থাকিলে প্রয়োজন এত তীব্র হইয়া দেখা দিত না। দূরে সরিয়া গিয়াছে বলিয়াই তার জায়গায় শূন্যতাটা এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো অমরেশ উপলক্ষ্য মাত্র, সদ্য জাগ্রত যৌবনের দুর্নিবার আবেগ আপনাকে প্রকাশ করিবার একটা পথ চায়।

নিজেকে বাঁচাইবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, মন্দিরাই জানে। ইতিমধ্যে আনন্দময় নিশ্চেষ্ট নাই। স্কুল হইতে ফিরিয়া অমিয়ার উদ্দেশে কহিলেন—মেয়েটাকে চট্ করে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে দাও দিকিনি, ঝিঁকরগাছার তারা আজকে দেখতে আসছে।

অমিয়া কহিল, কেন? আসছে রবিবারে আসবার কথা ছিল না?

—ছিল তো হয়েছে কি? আজই আসবে তারা, তাদের খুসী। তোমার ওই ধিঙ্গি মেয়ের কলকাত্তাই চালের সাজগোজ খুলে ভদ্রলোকের মেয়ের মত যা হয় একটা পরিয়ে দাও।

অমিয়া বিপন্নভাবে কহিল—আমি আবার ওর কি করে দেব? তাছাড়া ওর চেহারায় কিছু না সাজলেও চলবে।

—ওই গুমোরেই গেলে, লম্বায় যে আমার মাথা ছাড়িয়েছে সে হুঁস আছে? আর রং তো হাস্থ বাসুর চেয়ে ময়লা বই ফরসা নয়।

বাহিরের লোকের কাছে অবশ্য অন্য কথা বলেন আনন্দময়।

পাত্রী দেখিতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের কাছে সালঙ্কারে মেয়ের গুণবর্ণনা করিয়া অবশেষে বলেন—চেহারার কথা আর নিজে কি বলবো আপনারা দেখে নেবেন—কইরে লাট্টু তোর বড় দিদিকে নিয়ে আয় না।

লাট্টু আসিয়া সভয়ে নিবেদন করিল—বড়দি বললেন, মাথা ধরছে, আসতে পারবেন না।

—মাথা ধরেছে? অ্যাঁ বলিস কি! আঃ সারা সকালটা হেঁসেলঘরে থাকবে, মানা

শুনবে না তো! অত করে বললাম আজকের দিনটা অন্ততঃ বন্ধ দে, তা মা লক্ষ্মীর মন উঠলো না। নিজে হাতে করে সকলকে না খাওয়ালে তার আর—যাই দেখে আসি! পারবেনা বললে কি চলে? ভদ্রলোকেরা এসেছেন—বলিয়া আনন্দময় ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া যান।

অমিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল, আজ যে কি মহাপ্রলয় ঘটিবে তাই ভাবিয়া তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। মন্দিরাকে অবশ্য সাধ্যমত বুঝাইয়াছে সে, কিন্তু মন্দিরাও আনন্দময়েরই কন্যা।

তবে মাকে সে জ্বালাতন করে নাই, শুধু হাসিয়াছে আর বলিয়াছে—আচ্ছা মা, তুমি অত ভয় পাও কেন বলতো? বড্ড বাপু বোকা মেয়ে তুমি! যত ভয় করবে ততই ঠকে যাবে। চোখ রাঙাতে শেখ, দেখবে আনন্দ সান্যাল 'স্পিক্‌টি নট্'।

হতাশ অমিয়া অবশেষে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছে।

আনন্দময় ভিতরে ঢুকিয়াই চাপা গর্জ্জনে 'মা লক্ষ্মী'র উদ্দেশে কহিলেন—সে হারামজাদী লক্ষ্মীছাড়ি গেল কোথায়?

অমিয়া চোখের ইঙ্গিতে একখানা ঘর দেখাইয়া দিল।

দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া আনন্দময় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দুয়ারের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কহিলেন—তুমি কি ভেবেছো বল্‌তে পারো?

মন্দিরা নিবিষ্টচিত্তে নাট্টুর অঙ্কর খাতা পরিদর্শন করিতেছিল, পিতার কথায় চমৎকারের ভঙ্গীতে পিছনের দিকে তাকাইয়া কহিল - ভাবছি, নাট্টু এবার প্রমোশন পেলে হয়, আঁকে যে রকম কাঁচা!

—রেখে দাও তোমার আঁক, আর তোমার গুষ্টির মাথা। বলি, বাইরে যেতে পারবেনা বলেছ কেন শুনি?

ছদ্ম সরলতা ত্যাগ করিয়া মন্দিরা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে কহিল—তা'র কারণ, এখানে যখন বিয়ে হতেই পারে না, তখন শুধু শুধু কেন কষ্ট করে বাইরের লোকের সামনে বেরবো?

—যথেষ্ট জ্যাঠামী হয়েছে, হতে পারে না মানে কি? আলবাৎ হবে।

—না অসম্ভব।—বলিয়া মন্দিরা আবার খাতার পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে।

—আমি এইখানেই বিয়ে দেব তোমার। শীগগির চলো, যদি ভালো চাও।

—আচ্ছা যাচ্ছি।—বলিয়া খাতা মুড়িয়া দাঁড়ায় মন্দিরা।

সাজগোজের কথা বলিবার ভরসা বা স্পৃহা হয় না আনন্দময়ের। তবে সর্ব্বদাই এতো ভালো ভালো শাড়ী ব্লাউজ পরিয়া থাকে মন্দিরা যে, এ অঞ্চলে তাহাকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর সাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সব চাইতে কম ভালো শাড়ীগুলাই তাহার এইরূপ।

তবু বিশেষ করিয়া আজ সে চুল বাঁধিয়াছে চাঁচিয়া ছুলিয়া কপাল বাহির করিয়া।

বিষদৃষ্টিতে একবার মেয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দময় তাহাকে সেই অবস্থাতেই একরকম টানিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া যান।

মেয়ের এরূপ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অবশ্য পাত্রপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না, তবু ভদ্রতা বজায় রাখিয়া তাঁহারা 'মা লক্ষ্মী এসো মা' বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

পাত্র দ্বিতীয়পক্ষ, দলের মধ্যে তিনিও ছিলেন, কিন্তু আত্মগোপন করিয়া। কারণ বিবাহ করার উদ্দেশ্য তাঁহার কয়েকটি মাতৃহারা শিশু-সন্তানের লালনপালনের জন্য। মেয়েটি তদুপযুক্ত হইবে কি না সেইটি শুধু দেখিয়া লওয়া—এই আর কি।

অবস্থাপন্ন লোক। জোত-জমা বিস্তর আছে, এবং এ বাজারে যে ধানজমি ক্ষেত-খামার অপাঙ্‌ক্তেয় নহে সে জ্ঞানটুকুও বিলক্ষণ আছে। মেয়েটি সুন্দরী বয়স্থা এবং কলিকাতায় শিক্ষিতা শুনিয়াই তিনি এতটা ঝুঁকিয়াছেন।

মন্দিরা শান্তভাবে আসিয়া বসিল, প্রণাম করিল এবং পুরোহিতের প্রশ্নোত্তরে যখন নির্ব্বিবাদে নিজের নামও বলিল, তখন আশ্বস্তচিত্ত আনন্দময় মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—এই তো তড়্‌পানি বন্ধ হয়ে গেছে। হুঁ বাবা, যা ধমক দিয়েছি—মেয়েমানুষ চোখ রাঙালেই জব্দ। সাধে কি আর বলে কুকুরের জাত।

সহসা একটি শব্দ বজ্রপতনের মত সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

—আচ্ছা, বিবাহিতা মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ আপনারা ভাল বলেন?

পাত্রের মাতুল সচকিত প্রশ্নে কহিলেন—বিবাহিতা কন্যার বিবাহ? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা লক্ষ্মী?

—দেখুন, আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো, বাবা আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে চান জোর করে—পাত্র শুনেছি বিপত্নীক, সধবা বিধবা কিছুতেই তাঁর আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আপত্তি আছে যথেষ্ট। এখন আপনারা—

আনন্দময় এতটা কথা মন্দিরাকে বলিতে দিলেন বোধ করি বাক্‌শক্তির অভাবে, কিন্তু আর সহ্য করিতে না পারিয়া হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া ওঠেন—থাম্ সর্ব্বনাশী, যা মুখে আসছে তাই বলছিস যে?

মাতুল হাত ধরিয়া ধীরস্বরে কহিলেন—আপনি থামুন সাণ্ডেল মশাই, ব্যাপারটা পরিষ্কার হোক্।...সবটা খুলে বলতো মা লক্ষ্মী!

'মরিয়া' নামক যে অবস্থা আছে একটা, তাহারই চরম সীমায় উঠিয়া মন্দিরা মুখ তুলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে কহে—খুলে বলবার বেশী কিছু নেই—স্বামী নিরুদ্দেশ, বাবা বোধ করি আর খেতে পরতে দিতে অক্ষম, কাজেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মাতুল ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—সাণ্ডেল মশাই!

সাণ্ডেল মশাই মেয়ের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সেকাল হইলে বোধ করি মন্দিরার ভস্ম হইতে বিলম্ব হইত না, কলির ব্রাহ্মণ 'ঢোঁড়া সাপের' সামিল বলিয়াই অক্ষত দেহ লইয়া সে বসিয়া রহিল।

পাত্রপক্ষ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

'পাড়াগেঁয়ে' হইলেই যে বোকাসোকা হইবে, মন্দিরার এ ধারণাটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভুল।

ব্যাপারটা রহস্যময় হইলেও মন্দিরার কথাটা যে তাঁহারা যথার্থই বিশ্বাস করিয়াছেন এমন মনে করিবার হেতু নাই।

স্বয়ং পাত্র আশাভঙ্গের দারুণ মর্ম্মবেদনায় সক্ষোভ হাস্যে কহিলেন—আচ্ছা এক রগড় দেখতে আসা গিয়েছিল, কি বল মামা? আশ্চয্যি কাণ্ড!

মন্দিরাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টুকটুকে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরা ঝিকঝিকে দুইটি দাঁতে ঈষৎ হাসির আভাস আনিয়া কহিল—আশ্চর্য্য কাণ্ডের অভাব কি বলুন? আপনার স্ত্রী তো শুনেছি বাইশ বছর ঘর করে মারা গেছেন—নাতি নাতনীর অভাব নেই, তবু অনায়াসেই নতুন করে আবার বিয়ে করবার সখ হ'ল—আশ্চর্য্য নয়?

বলিয়া সুস্পষ্ট অবহেলার ভঙ্গীতে দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। ইহাকেই যে পাত্র বলিয়া চিনিল কেমন করিয়া সেটাও কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

ক্রোধ প্রকাশের প্রধান পথ রসনা। যাঁহারা অপমানিত হইয়া চলিয়া গেলেন তাঁহারা যে রসনার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া যাইবেন না এটা আশা করা অন্যায়।

'চল হে চল, খুব শিক্ষা হ'ল', 'সাণ্ডেলকে দেখে নেব, আমিও রতন মুখুজ্যে', 'মিলিটারি মেয়ে', 'স্বামী কি সাধে নিরুদ্দেশ হয়েছে, মনের ঘেন্নায়—'প্রভৃতি নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আর একবার আনন্দ সান্যালকে শাসাইয়া বাহির হইয়া গেলেন তাঁহারা।

এদিকে অমিয়া পাঁচখানি রেকাবিতে গোকুলপিঠে, নারিকেল লাড়ু ও জিবেগজা সাজাইয়া বসিয়া আছে।

মন্দিরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই কহিল—যাক বাঁচা গেল, খাবারগুলোয় আর বাজে লোক ভাগ বসাবে না—আয় হাসু নাটু লাটু আমরা সদ্ব্যবহার করি জিনিসগুলোর।...বেলা কোথায় গেলি, তুই তো খুব ভালবাসিস গোকুলপিঠে। ...আচ্ছা মা, এর নাম গোকুলপিঠে হ'ল কেন বলতো? গোকুলের লোকে বুঝি শুধু এই খেয়েই থাকত?

অমিয়া মেয়ের উচ্ছ্বাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া ব্যস্তভাবে বলে—এই দেখ পাগল মেয়ের কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা খাবে যে রে!

—আর তোমার ভদ্রলোক! তাঁরা এতক্ষণে হাটতলা ছাড়িয়ে গেলেন।

আনন্দময় প্রথমটা ভাবিলেন—মেয়ের মাথায় একখানা থানইট ছুঁড়িয়া মারেন, কিয়ৎকাল পরে মনে হইল কাঁচা বেত লইয়া আগাপাশতলা বিতাইয়া দেন, অবশেষে স্থির করিলেন—দূর করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা।

সেই সাধু সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরা মহোৎসাহে ভাইবোনেদের সহিত মিষ্টান্নপর্ব্ব সমাধা করিতে সুরু করিয়াছে।

ধারালো আর সারালো যে ভাষাটি মক্স করিয়া আসিতেছিলেন, কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। মন্দিরাকে ছাড়িয়া অমিয়াকে উদ্দেশ করিয়া আনন্দময় কহিলেন—গলায় দড়িদাওগে, গলায় দড়ি দাওগে—দড়ি যদি না জোটে আঁচলে ফাঁস দিয়ে আড়ায় ঝোলো গে। ছি ছি ধিক্!

হঠাৎ প্রেমময় স্বামীর এইরূপ এলাহি হুকুমে গ্রীষ্মের দিনেও অমিয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে। শঙ্কিতদৃষ্টিতে একবার মেয়ের ও একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ব্যাপারটা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে।

মেয়ে অবশ্য নির্ব্বিকার।

আনন্দময় এবার ধাতস্থ হইয়া মেয়েকে লইয়া সুরু করেন—তোমার মতন কুলাঙ্গার মেয়েকে বেশী কিছু বলবার দরকার নেই, শুধু আমার নয়—সাতেল বাড়ীর—এ বংশের কলঙ্ক তুমি। তুমি আমার মেয়ে, একথা মনে করে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

—আমারও বাবা!—আস্তে আস্তে কথাটা উচ্চারণ করে মন্দিরা।

বোধ করি 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন এই প্রথম।

আনন্দময় যেন রাগ করিবারও দিশা খুঁজিয়া পান না। জিবেগজায় কামড় দিতে দিতে অবলীলাক্রমে এতবড় কঠিন কথাটা বলিয়া বসিস? আনন্দময়ের কন্যা বলিয়া লজ্জায় তাহারও মাথা কাটা যাইতেছে? কতটা গর্জ্জন করিলে এতবড় ধৃষ্টতার উপযুক্ত হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়াই যেন হঠাৎ গুম্ হইয়া যান আনন্দময়।

কিন্তু দেখিয়া লইবেন তিনি যতীন মুখুজ্যের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে। শেষোক্ত সঙ্কল্পটি সশব্দে স্বগতোক্তি করিয়া যান আনন্দময়। অগত্যা অমিয়াকেও পিছন পিছন যাইতে হয়, ভাবনায় যে পেটের ভাত চাল হইয়া গেল তাহার।

সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল—এ সব কী কাণ্ড মন্দিরা?

—কাণ্ড কিছুই না মা! বাবার অমন নাদুসনুদুস জামাইটি হাতছাড়া হয়ে গেল, তাই খেদ হয়েছে। তা' অঞ্জুর সঙ্গে দিলেও মন্দ হ'ত না, কি বলিস বেলা? বয়সেও বেশ মানিয়ে যেত—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে মন্দিরা।

—'বিয়ে হয়ে গেছে,' 'স্বামী নিরুদ্দেশ', এসব কী কথা? বানিয়ে বলবার আর কথা খুঁজে পেলে না?

—সত্যি কথাই মা!

—কী সত্যি?

—ওই যা বললাম। তোমরা আর আমাকে লজ্জাসরম রাখতে দিলে না বাবু, এমনিতেই তো বলো আমি নাকি ভারী বেহায়া।...মা, রাগ করলে? কর, আমার দুর্ভাগ্য! যদি কখনো খুঁজে পাই, যদি তোমার কাছে এনে দেখাতে পারি, সেদিন কিন্তু রাগ করে থেকোনা যেন।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হঠাৎ বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু গালের উপর গড়াইয়া

পড়ে। মন্দিরার মত মেয়েও তাহা হইলে 'সিরিয়াস্' হইতে পারে? কিন্তু হারানো মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিবে এ কি সর্ব্বনাশা পণ করিয়া বসিল মন্দিরা?

রাত্রে আনন্দময় ও অমিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া পাশের ঘরে শুইতে গেলে মন্দিরা আপনার ছোট সুটকেসটিতে খানকয়েক শাড়ী ব্লাউস ভরিয়া গুছাইয়া লইয়া বড় ট্রাঙ্ক ও সুটকেসটা খুলিয়া রাশিকৃত শাড়ী বাহির করিয়া কহিল—বেলা, হাসু, মঞ্জু, কোন কোন শাড়ীটা কার পছন্দ হয় বল?

এক মাত্র বেলা ছাড়া শাড়ী পরিবার উপযুক্ত বয়স কাহারও হয় নাই, তথাপি হাসু মঞ্জু আগেই দুইখানা শাড়ী তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। শুধু বেলাই বিস্মিতস্বরে কহিল—কেন বড়দি?

—এমনি। এই সব তোকে দিয়ে দিলাম। ট্রাঙ্কটা সুদ্ধ।

—বাঃ! পরিহাস ভাবিয়া হাসিয়া ওঠে বেলা। বড়দি আসিয়া পর্য্যন্ত অবশ্য সাজিবার সখ তাহার যে লআনা মিটিয়াছে, তাই বলিয়া যথাসর্ব্বস্ব দান? ট্রাঙ্ক সুটকেশ সমেত!

—সত্যিরে বেলামণি, ওসব আমার আর দরকার নেই। সব নিস তুই।

—হেজলিন পাউডার, সাবান-টাবান, চিরুনি-টিরুনি, বই-খাতা সব?

—সব রে সব। মন্দিরা হাসিয়া উঠে—বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি? আর শোন্, লাটু নাটু বাসুকে যা চাইবে কিনে দিস, টাকা থাকলো ট্রাঙ্কে, বুঝলি?

—কেন বড়দি তুমি কোথায় যাবে?

শঙ্কিত দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে বেলা।

—কোথায় যাবো? তা তো জানিনা রে—কতকটা আপনার মনেই বলিতে থাকে মন্দিরা —কে জানে কতো দূরে, কোন্ দেশে—

—বাবা বকেছে বলে রাগ করে চলে যাবে বড়দি?

—দূর পাগলী!

ছোট ভাইবোনগুলির গাল ধরিয়া আদর করে মন্দিরা, কাছে টানিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, ঘুমন্তগুলিও বাদ যায় না।

—আর তোর বিয়ের সময় যদি না থাকি, এইটা প'রে বড়দিকে মনে করিস—বলিয়া গলার হারটা খুলিয়া বেলার গলায় পরাইয়া দিতেই বেলা কাঁদিয়া ফেলিয়া দিদিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—হার চাই না বড়দি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, যেয়োনা ভাই।

চকিতের জন্য একবার মনে হয়, থাক্ দরকার নাই। অসম্ভবের আশায় কোন পথে পাড়ি দিবে সে? তার চেয়ে এই বা মন্দ কি? ইহাদের লইয়াই কি হাসিয়া-খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেওয়া যায় না? ইহাদের কাছে থাকিলে নিজেকে কত বড় লাগে!

কিন্তু তাই কি হয়? কোন দুঃখ অমরেশের এমন গভীর হইল, যা ঘর ছাড়া করিয়া ছাড়িল তাহাকে, সেই হিসাবটা লইবে কে? চোখ বুজিয়া নিজের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়াই বা ক'দিন চলিবে মন্দিরার? কেবলমাত্র নিজেকে 'বড়' ভাবিবার মধ্যে গৌরব যতোই থাক, খোরাক কই? দুধ জিনিসটা ভালো, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন হয় ডাল ভাতের।

চোখ মুছাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলে—না গিয়ে আমার উপায় নেই বেলু, যেতেই হবে।

—কোথায় যাবে বল না বড়দি?

—যাবো? যাবো আমার নিরুদ্দেশ বরের সন্ধানে। বুঝলি রে বোকা মেয়ে!

॥ দশ ॥

বিজয় মল্লিক এতদিনে উপযুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছে।

নাইটস্কুল অবশ্য যথানিয়মে উঠিয়া গিয়াছে। বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের উদ্দেশ্যে যে 'দি বান্ধব হোমিও হল' খুলিয়াছিল, তাহারও অস্তিত্ব এখন আর নাই।

এখন বিজয় মল্লিক 'জ্যোতির্ময়ী বিধবাশ্রমের' সেক্রেটারী।

বিজয় মল্লিকের ভরসা করিয়া জ্যোতির্ময়ী এই আশ্রম খুলিয়াছেন, অথবা জ্যোতির্ময়ীকে কেন্দ্র করিয়া বিজয় মল্লিকই খুলিয়াছে, আলাদা করিয়া বলা কঠিন। আপাততঃ একজনের অর্থে ও অপরজনের সামর্থ্যে এই নাতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি সতেজে চলিতেছে।

তিনতলায় খানদুই ঘর ব্যতীত বিরাট বাসভবনের সমস্ত অংশই জ্যোতির্ময়ী আশ্রমে দান করিয়াছেন! নানা বয়সের বিধবা মেয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচের তলায় 'তাঁত ঘর', 'চরকা ঘর', 'সেলাই ঘর' প্রভৃতি অনেক কিছু কাণ্ডকারখানা।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া বেড়ায় বিজয় মল্লিক এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চেষ্টায়। পৃথিবীর আরো অসংখ্য লোকের অভাব অশান্তির চিন্তা করিতে অবসর নাই বলিয়াই বোধ করি এতদিনে শান্তি পাইয়াছে বিজয়।

তাই বা শান্তি পাওয়া বলা যায় কেমন করিয়া? এই আশ্রমের জন্যই তো তাহার অশান্তির শেষ নাই। এই প্রতিষ্ঠান আরো বড় আরো বিরাট হয় না? পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক জেলায় ছড়ানো থাকিবে ইহার শাখা-প্রশাখা!

বাংলা দেশের সমস্ত বিধবাকে আশ্রয় দিতে পারিলেই যেন যথার্থ শান্তি হয় বিজয়ের। গাধার মত খাটিয়া মরিতে হয়, তাই রাত্রির গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিবার ফাঁক থাকে না। দিবা দ্বিপ্রহরে জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখে বিজয় মল্লিক।...

দুই পাঁচ হাজার চরকা ঘুরিতেছে একতালে...এক ছন্দে ওঠা-নামা করিতেছে শত শত মাকু...সারা বাংলা ছাইয়া গিয়াছে আশ্রমবালাদের হাতেকাটা সুতার খদ্দরে...ঘরে ঘরে ছেলে বুড়ো সকলের গায়ে সার্ট, প্যাণ্ট, ফ্রক, পাঞ্জাবী—সেলাইঘরের অপূর্বকীর্তি!

বিধবারা আর অপরের গলগ্রহ নয়, সংসারের আবর্জ্জনা নয়, স্বাধীন স্বাবলম্বী উপার্জ্জনশীল স্বপ্ন দেখা নিবারণ করিবার উপায় নাই।

গড়েরমাঠের গরু কি অড়রক্ষেতের স্বপ্ন দেখে না? পেট ভরিলেও দেখে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর দিন আর কাটিতে চাহে না।

প্রবীর নাই, মন্দিরা নাই।

একজনকে জ্যোতির্ম্ময়ী স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়াছেন, আর একজন জ্যোতির্ম্ময়ীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ত্যাগ ছাড়া আর কি? যখনই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরের কীর্ত্তির কথা মনে করিবার চেষ্টা করেন, ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া যান।

জ্যোতির্ম্ময়ীর জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রয়, একমাত্র গৌরব প্রবীর, কোন্ তুচ্ছবস্তুর লোভে আপনাকে নষ্ট করিয়া বসিল?

জ্যোতির্ম্ময়ীর উঁচু মাথা চিরদিনের জন্য হেঁট হইয়া গেল না কি?

বাধ্য বিনীত মার্জ্জিতরুচি ভদ্র ছেলে জ্যোতির্ম্ময়ীর, উচ্ছন্ন যাইবার জন্যও মায়ের কাছে মত চাহিতে আসিয়াছিল। বলিয়াছিল—মা, তোমার কাছে আমি অনেক বড় উত্তরের প্রত্যাশা করে এসেছিলাম—তুমি তো শুধু আমার মা নয়, আমার বন্ধু। আমার দুর্দ্দিনে তোমার সাহায্য পাবো এ আশাটুকু কি অন্যায়?

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরের আকাঙ্ক্ষিত 'বড়' উত্তর দিতে পারেন নাই।

জগতে কোন মা কবে পারিয়াছে? সন্তানের মমতা যতই গভীর হোক, তবু সন্তানের হৃদয়ের পানে চাহিয়া আপন স্বার্থ খর্ব্ব করিবার ক্ষমতা আর যাহার থাক মায়ের থাকে না।

সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে গুরুমন্ত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন তাহারও নূতনত্ব হ্রাস হইয়াছে, ধ্যানের মন্ত্রে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠে না। লক্ষ জপ করিবার সংকল্প লইয়া যে মালা হাতে জপের আসনে বসেন, সে মালা কখন হাত হইতে খসিয়া পড়ে তাহার হিসাব থাকে না।

স্বামীর এনলার্জ করা প্রমাণ সাইজের ছবি, রূপার ফ্রেম, গুরুদেবের খড়ম, আর সোনার সিংহাসন, বালগোপালের মূর্ত্তি ও তাঁহার সেবার অসংখ্য উপকরণ, একে একে অনেক কিছু আসিয়া জড় হইয়াছে পূজার ঘরে।

প্রথমে উৎসাহের অবধি ছিল না, এখন ধূলার পুরু স্তর জমিয়াছে রূপার ফ্রেমে আর সোনার সিংহাসনে।

চন্দনকাঠের পালঙ্কে নেটের মশারি ফেলিয়া বালগোপাল তাঁহার ছোট্ট বালিশটিতে মাথা রাখিয়া দিনের পর দিন ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে ঘুম ভাঙাইয়া টিপ কাজল পরাইয়া, চূড়া-বাঁশীতে সাজাইয়া, ক্ষীর ননী খাওয়াইয়া গোষ্ঠে পাঠাইবার খেলা আর ভাল লাগে না।

বিস্বাদ বিবর্ণ দিনগুলি যেন বাঁধিয়া মারিতেছিল জ্যোতির্ময়ীকে। কাহারও জন্য কিছুই করিবার নাই, কী ভয়ঙ্কর এই অবস্থা!

মন্দিরা হাতখরচ ফিরাইয়া দেয়, প্রবীর অর্থ সাহায্য লইবে না পণ করিয়াছে, এত অর্থ লইয়া তবে করিবেন কি জ্যোতির্ময়ী? দীর্ঘ জীবনভোর যতীন মুখুজ্যে যে ভিতরে ভিতরে কত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, এতদিনে তাহা ধরা পড়িয়াছে।

এমনি দুর্দিনে বিজয় মল্লিক আসিয়া ধরা দিল বিধবাশ্রমের আইডিয়া লইয়া। এখন দিনগুলা তবু কতকটা সহনীয় হইয়াছে। কথায় কাজে, আলাপে আলোচনায়, নূতন নূতন দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সহজে কাটিয়া যায় দিন।

জীবনেই কি আসে নাই কিছু সরসতা? খ্যাতির আর তোষামোদের মিষ্টিরস কম সারালো সার নহে। নির্বিচারে সকল বয়সের বিধবারা 'মা' বলে। শুধু মা নয়, 'দেবী মা'!

বিজয় শিখাইয়াছে।

ছাঁটা কোঁকড়ান চুলের উপর সাদা গরদের থান বেড়িয়া প্রশান্তমুখে যখন আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ান জ্যোতির্ময়ী, সত্য সত্যই দেবীর মত দেখিতে লাগে। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাওয়া মোমবাতির মত যাহা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল, বিজয় মল্লিক তাহাতে নূতন পলিতা সংযোগ করিয়া কাজে লাগাইয়াছে।

এসব কাজের অবশ্য দায়িত্ব সোজা নয়, তবে মানুষ যখন দেবীর প্রাপ্য সম্মান পাইতে থাকে, তখন দেবীর মত কঠিনও হইতে হয় বৈ কি। আশ্রমের কড়া আইনের ফাঁকে কে কখন কি বে-আইনি কাণ্ড করিয়া বসিল সে দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখিতে হয় অহরহ। এতটুকু অসতর্ক হইবার জো নাই।

রাত্রে গেটের চাবি পড়িলে চাবি গচ্ছিত থাকিবে জ্যোতির্ময়ীর নিজের কাছে। চিঠি যদি কাহারও আসে, পাশ হইয়া আসিবে জ্যোতির্ময়ীর হাত দিয়া। চিঠি লিখিতে গেলেও সেই এক হুকুম।

তাছাড়া কে উপাসনায় সময় দিয়াছে কম, আর স্নানের ঘরে সময় লাগাইয়াছে বেশী, কাহার ঘুম ভাঙিতে বেলা হয়, আর কাহার ঘুমাইতে যাইতে দেরী হয়, এসব তত্ত্বাবধান না করিলেই বা আশ্রম চলিবে কোন্ শৃঙ্খলায়?

তবু ইহার ভিতরও মাঝে মাঝে বেথাপ্পা ব্যাপারের অবতারণা হয় না এমন নয়। আট ফিট উঁচু প্রাচীরের অবরোধের মধ্যেও বেহায়া বসন্তবাতাস দৈবাৎ ঝাপটা মারিয়া যায়। মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারিণীর মনেও হঠাৎ একছোপ সবুজের আভাস লাগে। তাই জ্যোতির্ময়ীর নিশ্চিন্ত শান্তি ঘুচিয়াছে। এসব অনাচারের প্রশ্রয় দিলে চলে না, শাসন কড়া না হইলে বাঁধ-ভাঙা নদীর স্রোতের মত বিশৃঙ্খলার ঢেউ আসিয়া বিধবা-আশ্রমকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কিনা তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

তাই সেদিন সকালবেলা তিনতলার পূজার ঘর হইতে নামিয়াই কমলা নামের যে মেয়েটি কিছুদিন হইল ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া পড়িলেন।

কমলার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযোগ সাবান মাখা লইয়া। আশ্রমের নিয়মানুসারে সে আসিয়া মাথা মুড়াইয়াছে, নরুণপাড়ের ধুতিখানা ছাড়িয়া সাদা থান ধরিয়াছে, আহারাদিতেও তাহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আসে নাই, কিন্তু ওই—সাবান সে মাখিবেই।

কেমন করিয়া জোগাড় করে সে কথা বলা শক্ত, কিন্তু দেখা যায় সুযোগ পাইলেই সে উক্ত অপকর্ম্ম করিতে ছাড়ে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী তীব্র তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিলেন—কমলা, আবার তুমি সাবান মেখেছ?

রোগা শ্যামবর্ণা পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, বছর বাইশ বয়স হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু দেখিতে ছোট লাগে।

দেবী মা'র সামনে মুখ তুলিয়া কথা কওয়ার রেওয়াজ নাই, তাই মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। থাকিল বটে, তবে ভয়ে কাতর হইয়াছে দেখিলে মনে হয় না। বার বার তিরস্কারেও 'আর করিব না' এমন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে না পারিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য পয়েন্টটা ধরিলেন,বলিলেন—সাবান তোমায় কে জোগায় বলতে পারো?

ইহারই উত্তরে ফস্ করিয়া আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—বাগানের দরজা দিয়ে রোজ যে দেখা করতে আসে, সেই বোধ হয়।

বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান জ্যোতির্ম্ময়ী। কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বলেন—কমলা এসব কি শুনছি? কে দেখা করতে আসে?

—একটি ছেলে।

অস্ফুটস্বরে এইটুকুই শুধু বলিতে পারে কমলা।

—ছেলে, সেটুকু কষ্ট করে না বললেও চলতো—কে সে তাই জানতে চাচ্ছি।

—আগে আমাদের পাড়ায় থাকতো।

—ওঃ। তা বেশ, কিন্তু কি বলতে চায় সে? কি জন্যে আসে তোমার কাছে?

হঠাৎ মরিয়া হইয়াই যেন কমলা স্পষ্ট গলায় বলিয়া ফেলে—বলে যে ওর সঙ্গে চলে যেতে। আমি যাবো।

—কোথায় যেতে বলে?

—তা জানিনা।

তোমায় নিয়ে গিয়ে খেতে পরতে দেবার সামর্থ্য ওর আছে?

—তা জানিনা।

—তাও জানো না? চমৎকার! কি করে, কি নাম, তাও জানো না বোধ হয়?

—নাম অরুণ, কিছু করে না।

—শেষ পর্য্যন্ত না খেয়ে মরতে হবে সেটা জানো?

—ও বলে এখানে থাকলেও মরে যাবো।…আর—আর—দুটি ভাত খেয়ে সুধু বেঁচে থেকে লাভ কি? আমায় ছেড়ে দিন।

—তা'হলে এলে কেন?

—আমি ইচ্ছে করে আসিনি, বিজয়বাবু রোজ রোজ আমার কাকাকে বলে বলে রাজী করিয়েছিলেন। কাকারা দশ বছর ধরে পুষছেন, তাই রাজী হয়ে গেলেন।…ও তখন থেকেই আমাকে—কমলা চুপ করিয়া যায়।

নন্দরাণী একজন পাকা বিধবা। সাতচল্লিশ বৎসর যাবৎ বৈধব্য পালন করিয়া আসিতেছেন তিনি। আশ্রমে ভর্ত্তি হইবার মত অনাথা তিনি নন। শুধু এখন আতপ চাউলের দর সাতচল্লিশে উঠিয়াছে বলিয়াই চেষ্টা চরিত্র করিয়া অনাথার দলে নাম লিখাইয়াছেন।

মিথ্যা কথাও হয় না বটে—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যিনি নাথ-হারা হইয়া কাটাইয়াছেন, অনাথা ছাড়া কি আর বলা যায় তাঁহাকে? নন্দরাণী হাতের মালাটা কপালে ঠেকাইয়া খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিল, তখন থেকেই যদি এত পিরীত তো বেরিয়ে গেলেই পারতিস? আশ্রমে এসে ঢলাঢলি কেন?

ক্রুদ্ধ কমলা ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি আর মুখ নেড়ো না নন্দদি! তুমি চুরি করে খাওনা? একাদশীর দিন গোপালকে ঘুষ দিয়ে বেগুনী ফুলুরি আনালে না সেদিন? দেবী মা'র আংটিটা তোমার বাক্স খুঁজলে বেরোবে না? তবে? এসব বুঝি দোষ নয়?

জ্যোতির্ম্ময়ী অবাক হইয়া বলেন—ছিঃ কমলা, কাকে কি বলছো? থাকতে না চাও চলে যেও, তাই বলে—

নন্দরাণী নাচিয়া উঠিয়া কহিল—চলে গেলেই হ'ল? খাতায় নাম সই করেনি? বেরিয়ে গেলে আশ্রমের কেলেঙ্কারী নয়? ওর জন্যে কি নতুন আইন ছিষ্টি হবে নাকি? বলি কমলি, ইহকাল তো গেছে, পরকালের চিন্তেও কি এককড়া নেই।

কমলি বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া স্বচ্ছন্দে জানাইল—না। পরকালের চিন্তায় ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই তাহার।

মার্জ্জিত রুচিসম্পন্না বাসন্তী কমলার চাইতে সামান্য কিছু জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে উপদেশের সুরে মিহিগলায় কহিল—ছিঃ কমলা, এসব কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করে না তোমার?

কমলা বোধ করি এতগুলি রসনা আর দৃষ্টির সম্মুখে তোপের মুখে সৈনিকের মত মরিয়া হইয়াই উঠিয়াছিল, তাছাড়া সাবানের অপমান তখনো মর্ম্মান্তিক জ্বলিতেছিল, তাই তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—সবাই মিলে আমার সঙ্গে লাগতে এসনা বলছি—সকলের সব কথা বলে দেব।

বাসন্তী চাপাগলায় কহিল—কি কথা শুনি? বলবার আছেই বা কি?

—কেন থাকবে না? তোমার মাসতুতো ননদের দেওর—বিশু না কে—নিত্যি চিঠি দেয় না তোমায়? জানলায় ঢিল বেঁধে নাওনা তুমি? বিধুদিরা পান-দোক্তা খায়না চুপি চুপি? সুধারাণী খালি শুয়ে থাকে, কিছু খেতে পারে না, আর দেবী মা'র সামনে বেরোয় না কেন, জানি না বুঝি? তবে?

দেখা গেল যত ভালমানুষ ভাবা গিয়াছিল মেয়েটিকে তেমন নয়।

জ্যোতির্ম্ময়ীর দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া সমস্ত মুখ আগুনের মত রাঙা হইয়া আসে। দীর্ঘকাল দেবীগিরিতে পোক্ত না হইলে এত কথা হজম করিবার মত স্নায়ু সবল হয় না।

ব্রহ্মচর্যের যে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া এতগুলি অসহায়া নারীকে স্বর্গের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা সহসা যেন নিজেদের সঙ্গে তাঁহাকেও আছাড় মারিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল।

বিজয় মল্লিককে ডাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী আশ্রম ভাঙ্গিয়া দেবার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

আজ না ভাঙিলেও—ভাঙিতই একদিন।

বিজয় মল্লিকের বুকটাও ভাঙিয়া গেল।

যাক হয়তো কোনদিন দেখা যাইবে—ভাঙা প্রাণে পলস্তারা লাগাইয়া আবার কোন নূতন স্বপ্ন গড়িয়া তুলিতেছে বিজয় মল্লিক।

॥ এগারো ॥

দীর্ঘকাল পরে আবার মন্দিরাকে দেখিলাম।

পশ্চিমের এক অখ্যাত সহরে ধূলি-ধূসরিত ক্ষুদ্র একটি ধর্ম্মশালায়। বেশভূষার অবস্থাও ধর্ম্মশালার চাইতে খুব বেশী উচ্চাঙ্গের নয়, কিন্তু সে বিষয়ে বোধ করি সে নিতান্তই নির্ব্বিকার!

বসিয়াছে—'বাগান' নামধারি একটি আগাছার জঙ্গলের ধারে, চটাওঠা ইটভাঙ্গা সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া, আর ছোট ছেলেদের গল্পবলার ভঙ্গীতে পাশের ভদ্রলোকটিকে রূপকথা শোনাইতে সুরু করিয়াছে।

ভদ্রলোকটি যদিও মন্দ চকচকে ঝকঝকে নয়, কিন্তু ধূলায় বসিতে তাহারও আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

—হ্যাঁ কি বলছিলাম? তারপর কি না—ভোরের পাখী বাসা ছাড়বার আগে শুক-তারাকে সামনে রেখে দুঃখিনী রাজকন্যা নিষ্ঠুর রাজপুরী ছেড়ে চললেন তেপান্তরের মাঠ-ভেঙ্গে নিরুদ্দেশ রাজপুত্রের উদ্দেশে। কত মাঠ কত পথ পার হয়ে, কত নৌকো ইষ্টিমার রেলের গাড়ী গরুর গাড়ী চড়ে, অবশেষে এক সহরে এসে হাজির হলেন রাজকন্যা!

হলেন তো, কিন্তু কোথায় রাজপুত্র? মুস্কিল এই—এটা আবার কলিকাল। চোখের কাজল দিয়ে পদ্মপাতায় পত্ররচনা করে হংসদূতের মারফৎ, রাজপুত্তুরের সন্ধান নেবেন তার জোটি নেই।

কাজেই—অন্য বুদ্ধি খাটাতে হয়। তারপর—চোখের কাজলের বদলে ছাপার কালি, আর হংসদূতের বদলে সংবাদপত্রের স্তম্ভে বার্ত্তা পাঠিয়ে বসে বসে রাজপুত্তুরের আশায় দিন গোণে। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে—ভেবে ভেবে রাজকন্যার চক্ষে

ঘুম নেই। এদিকে—রং হ'ল ময়লা, দেহ হ'ল ক্ষীণ, মুখ হ'ল শুকনো আর, চুল হ'ল রুক্ষ, সাজ-গোজের কথা বলেই কাজ নেই—মোটের মাথায় রাজকুমারীর যখন একটি কাঠ-কুড়ুনীর মত অবস্থা, তখন নিষ্ঠুর রাজকুমার এসে দিলেন দেখা।

বললেন—রাজকন্যা, কি বার্ত্তা?

রাজকন্যা বলেন—সাধনার সিদ্ধি হ'ল এই বার্ত্তা।

রাজপুত্তুর বলেন—সিদ্ধি তো হ'ল, এখন চাও কি?

—কিচ্ছু না, শুধু তোমাকে।

শ্রোতা ভদ্রলোকটি হঠাৎ ভারী যেন রেগে উঠে—'কিছু না শুধু তোমাকে'—মানে? আমি বুঝি 'কিছু না'র সামিল?

—তুমি? তোমাকে আবার কে কি বললো? গায়ে পেতে নিচ্ছ কেন? আমি তো শুধু গল্প বলছি।

—হোক গল্প, আমিও অল্পে ছাড়ছি না।

'অল্পে' তো দূরের কথা, অনেক কষ্টেও রেহাই পায় না বেচারা।

—কি হচ্ছে? জানো এটা ধর্ম্মশালা?

—হয়েছে কি? অধর্ম্ম কিছু করছি নাকি?

—হয়েছে, হয়েছে, এত ভালবাসা কোথায় ছিল শুনি?

—ভালবাসা যেখানে থাকবার ঠিক সেইখানেই ছিল মন্দিরা, শুধু ভালবাসার লোকটিই ছিল দূরে।

—মিথ্যে কথা বোলো না বেশী,—মন্দিরা স্বভাবগত শাসনের সুরে প্রায় ধমকই দেয়—নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম বুঝি আমি? জানো এতে আমার কত অপমান হয়েছে?

—অপমান কিছু হয়নি মন্দিরা, কাছে থাকলে তোমার এ মনকে তুমি সহজে খুঁজে পেতে না। অভাবেই অভাব বোধটা এত তীব্র হয়ে ধরা পড়ে।

—হয়তো তাই, কিন্তু সত্যি বলছি, এতদিন ধরে শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নই তোমার কাছে ছিল আমার—ভালবাসলে যদি তো কেন চলে গেলে?

—একটিমাত্র উত্তরে ও কৌতূহল মিটবে না মন্দিরা, ওর পিছনে জমানো আছে অনেক গ্লানির ইতিহাস। ভালবেসে ধিক্কার এসেছিল, ভেবেছিলাম ভালবাসার যথার্থ অধিকার আমাদের নেই, এত ছোট এত হীন এত তুচ্ছ আমরা!

—কিন্তু ভালবাসাই কি আমাদের বড় করে তোলে না? সমস্ত গ্লানির উপর এনে দেয় না গভীর মর্য্যাদা? সত্যি করে ভালবাসলে নিজেকে আর ছোট মনে হয় না, হীন মনে হয় না, তুচ্ছ মনে হয় না। কিন্তু থাক ওসব কথা, এ সব সাধু ভাষায় কথা কইলেই বেজায় হাসি পেয়ে যায় আমার। তার চেয়ে তুমি বল তোমার অজ্ঞাতবাসের কাহিনী।

—তার আগে তুমি বদলে এসো তোমার কাঠকুড়ুনির বেশ। এখান থেকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলে ভেবে অবাক লাগছে আমার, আগে গাড়ী নইলে যে—আচ্ছা থাক্, পরে হবে

সব কথা। এখন যাও লক্ষ্মীটি গায়ের ধূলো ধুয়ে ফেলো গে।

টুকটুকে ঠোঁটের উপর উদ্ধত দু'টি দাঁত ঝিলিক মারিয়া ওঠে, প্রিয় পরিচিত ভঙ্গীতে।

—ধূলো শুধু শাড়ীতে, গায়ে ধূলো লাগে না আমার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরেশ মন্দিরার খোঁজ করিতে আসিয়া অবাক। অমরেশের খোলা সুটকেসের সামনে গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে মন্দিরা, বেশভূষার পরিবর্ত্তন কিছুই করে নাই।

—এ কি, কি হ'ল তোমার?

—তোমার সুটকেসে এত শাড়ী কেন শুনি!

—ও হো হো, এখুনি চোখে পড়েছে? কিন্তু যদি না বলি?

—বলতে বাধ্য।

—এখন থেকেই শাসন সুরু?

—নিশ্চয়।

—সত্যি কথা বিশ্বাস করবে মন্দিরা? হেসোনা কিন্তু? কোম্পানীর এজেন্সি নিয়ে কত দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে—বম্বে, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ। শাড়ীর দোকানের কাছাকাছি গেলেই তোমার গায়ে মানায় এমন শাড়ী একখানা কেনবার দুর্দ্দান্ত সখ হ'ত।

—অর্থাৎ সর্ব্বদা আমি তোমার অন্তরে বিরাজ করছিলাম—এই তো তোমার বক্তব্য? মন্দিরা ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে বলে—আমার বিশ্বাস এ কৈফিয়ৎ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যাক পরে এর বিচার হবে। আপাততঃ এই প্রিণ্টেড্ শাড়ীখানি দয়া করে গ্রহণ করলাম।

—এ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।

—উঁহু, বলতে হয়, আমি ধন্য।

—সেটা কি মুখে বলবার দরকার হবে মন্দিরা?

স্টেশনে আসিয়া মন্দিরা প্রশ্ন করিল—এখন কোথায় যাবে?

—এই গরীবের কুটিরে।

—একেবারে সোজাসুজি?

—লক্ষ্মী যখন নিজে এসে ধরা দিয়েছেন, তখন আর ছাড়বো কেন বল?

ঈষৎ চিন্তিত ভাবে মন্দিরা বলে—কিন্তু সংসারের চোখে, সমাজের চোখে, আমি হারিয়ে যেতে রাজী নই। তাছাড়া আমার মার কাছে আমার নিজের মার কাছে প্রতিশ্রুত আছি তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাবো বলে।

—কি বলে দেখাবে?

—বলবো? বলবো—মা দেখ তো, জামাই পছন্দ হয়?

—কি সর্ব্বনাশ! পারবে বলতে?

—অনায়াসে। এত তপস্যার পর বর মিললো—পারবো না? সেখান থেকে বিধিবদ্ধ ভাবে তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে—ভাবছি যাবো এলাহাবাদে দাদাভায়ের কাছে।

সহসা স্তব্ধ হইয়া যায় অমরেশ, একটু চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলে— সে হয় না মন্দিরা!

—কেন?

—সত্যি কথাই স্বীকার করবো মন্দিরা, মন থেকে সায় দেবার ক্ষমতা নেই। একথা ঠিক যে, দাদার ব্যবহার আমায় সর্ব্বদা পীড়ন করেছে, বৌদির নিরীহ বাধ্যতা, তাঁর বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, উত্তেজিত করে তুলেছে—অহরহ চেয়েছি তাঁর বন্দী জীবনের মুক্তি, কিন্তু তবু এ আমি সইতে পারবো না। হয়তো দূরে থেকে প্রার্থনা করবো তাঁদের কল্যাণ, কিন্তু বৌদিকে বৌদির মতন ভিন্ন অন্য ভাবে দেখবার সাহস আমার সত্যিই নেই। খোকন নেই, বৌদি আছেন, এ কি দেখা যায় মন্দিরা?

প্রফুল্ল দুইখানি মুখে নামিয়া আসে দুইটি মেঘছায়া।

হয়তো এই নিয়ম, সাংসারিক বিধি ইহাকেই বলে। পরিপূর্ণতার মাঝখানে দেখা দেয় শূন্যতা, আনন্দের উপর পড়ে বিষাদের ছায়া, জীবনের কোলাহলের ভিতর ধরা দেয় মৃত্যুর স্তব্ধতা।

॥ বারো ॥

উত্তর কলিকাতার এক অপরিসর গলির একপ্রান্তে হাড়-পাঁজরা সার সেই জীর্ণ বাড়ীখানি তার দীর্ঘ দেহখানি লইয়া এখনো একই অবস্থায় টিঁকিয়া আছে।

ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ষার জল বৈশাখের ঝড়, বারে বারে আসিয়া পুরানো বনেদের শিকড়ে ঘা মারিয়া কাঁপন ধরায়, ভাঙিতে পারে না।

বোমা যদি সত্যই কখনো বজ্রের বেশে নামিয়া আসে, তখনই হয়তো একদিন জরাজীর্ণ দেহটা লইয়া হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে, তার আগে নয়।

শুধু দেওয়ালের দাঁতগুলি হইয়া উঠিয়াছে আরো প্রখর স্পষ্ট, আরো নির্লজ্জ হইয়া উঠিয়াছে খাপরি ওঠা মেঝের নিরাভরণ নগ্নতা।

আজকাল চটা ওঠা রোয়াকের উপর শীতের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিবার লোভে যাহারা আসে, তাহারা বড় কথা লইয়া তর্ক করে না, বড় চিন্তা লইয়া মাথা ঘামায় না, সুদূরপ্রসারি দৃষ্টি মেলিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া থাকে না।

ছোট কথা লইয়াই তাহাদের কারবার।

সিঁড়ি ভাঙিতে কষ্ট হয় বলিয়া মেনকার মা আসেন বড়ির টিন লইয়া, বড়ি দিতে সদ্যবিধবা ছোটবৌ ম্লানমুখে আসে শিশুপুত্রের ভিজা বিছানা রৌদ্রে দিতে। উষাবতী তাসো

জোড়া কোল আঁচলে বাঁধিয়া গীতাখানা খুলিয়া বসে, তাস জোড়াটা বাহির করিতে লজ্জা পায়। আনিয়াছে, একথা টের পাইতে দেয় না কাহাকেও, তবু আনিতে ছাড়ে না।

ভাই যাওয়ার পর হইতে এই এক উপসর্গ জুটিয়াছে—চক্ষুলজ্জা। সহজ ভাবে হাসিতে, গল্প করিতে, তাস খেলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ ওসব না করিলেও যে প্রাণ হাঁফাইয়া আসে।

আর আসেন কৃষ্ণবালা।

হরিনামের ঝুলিগাছটা লইয়া বিরসমুখে বসিয়া থাকেন এক পাশে। ঝড় বৃষ্টির প্রলেপ কিছুটা লাগিয়াছে তাঁহার দেহে। সামনের কয়টা দাঁত পড়িয়া গিয়া মুখের ভাবে আসিয়াছে উগ্র নিষ্ঠুরতার পরিবর্ত্তে অসহায় কুশ্রীতা।

ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোর আভাস ইহাদের চোখে ধরা দেয় না—প্রত্যহ দেখা সংসারের, ঘটিয়া চলিয়া পুরাণো কাহিনীর পুনরাবৃত্তিই ইহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

নূতন যদি কেহ আসে, সোৎসাহে শুনাইতে বসে—পুরাণো দিনের গল্প।

আজ এ আসরে নূতন শ্রোতা আসিয়াছে মেনকা।

খোল বোয়াকে এতগুলো চোখের সামনে বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কোলের ছেলেকে শুন্য পান করাইতে করাইতে শ্বশুরবাড়ীর সুখ ঐশ্বর্য্যের গল্প ফাঁদিয়াছে।

বড় গিন্নী বড়ির ডালমাখা হাতখানা উধাবতীর প্রায় মুখের সামনে নাড়িয়া বলিয়া ওঠেন —এই শুন্‌লি তো? তখন আমার মেনিকে কানাঘুষো কতলোকে কত নিন্দেই করেছে, আর এখন? এনে দেখ্—মেনির আমার গোছাভর্ত্তি সোনার চুড়ি, পঞ্চাশখানা পঞ্চাশ রকমের শাড়ী সেমিজ, কোলে সোনারচাঁদ ছেলে, দেখছিস্ তো? বাবা ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। যাঁরা ভালোমানুষী দেখিয়ে ভিজে বেড়ালের মতন থাকতেন তাঁদের কীর্ত্তির কথাও ভাবো!

মেনকা মহোৎসাহে প্রশ্ন করে—হ্যাঁগা অখিলেশদার বৌর কথা যা শুনি তা কি সত্যি?

—কপাল আমার, সত্যি না তো কি মিথ্যে? শুনতে পাই এলাহাবাদে না কোথায় আছে। ছোঁড়া তো মায়ের ত্যাজ্যপুত্তুর, খেতে দেবার মুরোদ নেই—নিজে ইস্কুলে মাষ্টারী করে, ছুঁড়িকেও মেয়ে ইস্কুলে গানের মাষ্টারী করে পেটের ভাতের যোগাড় করতে হয়। অমন পিরিতের কাঁথায় আগুন! শুনতে পাই একটা মেয়ে না ছেলে কি হয়েছে! ছি ছি ছি—অমন সোনার পুতুল ছেলে হারিয়ে—

নূতন করিয়া আর একবার সকলের ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া আসে।

কৌতূহলী মেনকা বলে—অমরেশদা'র খোঁজ খবর কিছু পাওয়া যায় নি?

—ও মা তা জানিস না বুঝি, সে তো 'ইনসোর আপিসে' দিব্যি মোটা মাইনের চাকরী করছে—যতীন মুখুজ্যের দৌত্রীর মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। সেও এক কেলেঙ্কার কাণ্ড!

মেয়ে নাকি একলা হিল্লি-দিল্লী ঘুরে পাকড়াও করে এনে বিয়ে করেছে। কালে কালে কতই শুনবো, কতই দেখবো! বামুন কায়েতের বিয়েও তা'হলে 'চল' হ'ল!

মেনকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—অখিলেশ দা'র কি হ'ল শেষটা? হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে—

—গলায় দড়ি আর দেবে না? বেম্মচারীই হোক্ আর নাগা ফকিরই হোক—ব্যাটাছেলে তো? বিয়ে করা পরিবার—নাকের সামনে দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে পর-পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে গেল, কোন ঘেন্নায় মুখ দেখাবে পাঁচজনকে?

বিষদন্তহীন কেউটের মত নিস্তেজ কৃষ্ণবালাকে বেশী সমীহ করিবার আবশ্যকতা কেহ আর অনুভব করে না। আলোচনার স্রোত যথেচ্ছ বহিতে থাকে।

শুধু সমরের কথা উঠিতেই কয়েকটা করুণ নিঃশ্বাস চাপা-গলির রুদ্ধ বাতাসকে ভারী করিয়া তোলে। যুদ্ধে যাওয়ার পর হইতে আর কোন সংবাদ নাই তাহার।

হয়তো মারা গিয়াছে—হয়তো মারা যাইবে—একই কথা।

সুস্থ আর স্বাভাবিক মানুষ কালো গৌরাঙ্গ মোটাসোটা কালোকালো একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সুখে সংসার পাতিয়াছে। বোধকরি বংশের ধারা, আর জীর্ণ-গলির চিরন্তন জীবন-লীলার ধারা অব্যাহত রাখিবার ভার তাহারই।